গণিত ও কম্পিউটারের বিস্ময়

অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

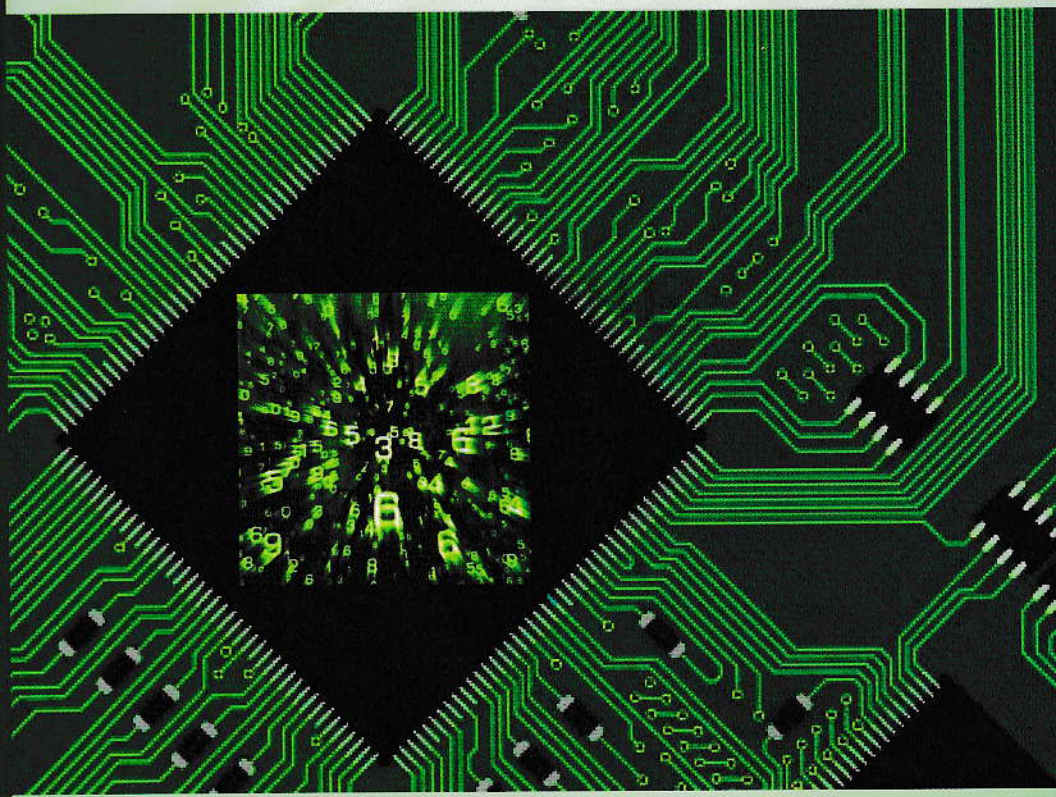

গণিত ও কম্পিউটারের বিস্ময়

অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্ষর প্রকাশনী

অক্ষর

প্রকাশক
মোঃ আমিন খান
৩৬ শ্রীশ দাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০১৭১৪৪২০৫৬৯

বিক্রয় কেন্দ্র
১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪

©
লেখক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রীশ দাস লেন
ঢাকা ১১০০

মূল্য
২০০.০০ টাকা

GONIT O COMPUTERER BISHMOY (Mathematics and Computer Surprise) by Aparesh Bandayapaddaya.
Published by Md. Amin Khan, Akkhar Prokashani
36 Shrish Das Lane, Banglabazar, Dhaka 1100
Price : Taka 200.00 Only

ISBN 978 984 90782 8 9

ঘরে বসে অক্ষর প্রকাশনী-এর যে কোন বই পেতে ভিজিট করতে www. rokomari.com/akkharprokashani
অথবা ফোনে অর্ডার করতে কল করুন ০১৫১৯৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

জ্যোতি, মৌ ও দীপুকে

ভূমিকা

গণিত এবং কম্পিউটার যেন একসূত্রে বাধা। একটি যেন অন্যটির পরিপুরক। গণিত ও কম্পিউটার বিষয়ক নানা ধরনের অজানা তথ্যের সমাহার ঘটিয়ে এই গ্রন্থটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতে গণিতের যেমন অজানা অনেক বিষয় পাঠকদের মনে বিশেষ নাড়া দেবে, ঠিক তেমনিই কম্পিউটারের বিভিন্ন বিষয়ও পাঠকের মনে আগ্রহের সৃষ্টি করবে। এমন অনেক কিছু এই গ্রন্থে রয়েছে, যা প্রথমবারের মতো বাংলাভাষায় লিখিত হলো। এক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি বিশেষত্বের দাবিদার।

গ্রন্থটি প্রণয়ন করার সময় আমি বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য ও সূত্র গ্রহণ করেছি নির্দ্বিধায়। এই গ্রন্থটির প্রকাশনা ক্ষণে তাদের সবার কাছেই আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অক্ষর প্রকাশনের কর্ণধারের নিরন্তর তাগিদের কথা স্মরণ করতেই হয়। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ব্যতীত গ্রন্থটি পাঠকের কাছাকাছি পৌঁছাতে আরো অনেক দেরি হতো। গ্রন্থটি পাঠকপ্রিয়তা পেলে আমার শ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

গণিত নিয়ে কিছু কথা	১১
কম্পিউটার নিয়ে কিছু কথা	১৮
আসকি সংখ্যা	৫২
গণিতের জন্ম	৫৪
অ্যাবাকাস	৬০
বৈদিক গণিত	৬৪
কম্পিউটার বিশ্বে প্রথম	৬৭
বৈদিক গাণিতিক সূত্র	৭৫
প্লাস্টিক সংখ্যা	৭৭
এনিয়াক	৭৯
গুণ করা	৮১
স্টোনহেঞ্জ	৮২
৯-এর রহস্যময় গুণ	৮৫
@ রহস্য	৮৬
গণিতে গ্রিক বর্ণ	৮৮
সুপারকম্পিউটার : বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পিউটার	৯০
কুইপু রহস্য	৯৩
১ কেন এক, ২ কেন দুই...	৯৭
রহস্যময় সংখ্যা	৯৯
প্রথম ব্যবহারযোগ্য কম্পিউটার	১০০
কিউবিট	১০৩
রাইন্ড প্যাপিরাস	১০৫
গুণ করো তো দেখি	১১০
ক্যালকুলেটর	১১১
মিটার এলো কোত্থেকে	১১২

২ এর সমান ১ ১১৪
পিথাগোরাসের উপপাদ্য রহস্য ১১৫
কোরিয়ান গণন দণ্ড ১১৮
পাই–এর রহস্য ১২০
মজার অঙ্ক ১২৩
টেবুলেটিং মেশিন ১২৫
কম্পটোমিটার ১২৯
অ্যাডভ্যাক কম্পিউটার ১৩১
বিশ্বসেরা গণিতবিদ ১৩৪
গণনা করার বোর্ড ১৪২
সালামিস ট্যাবলেট ১৪৩
আইবিএম–এর জন্মরহস্য ১৪৫
সফটওয়্যারের বিষয়–আসয় ১৪৭
ধারাবাহিক উইন্ডোজ ১৫৩
পবিত্র কোরআন শরিফে গণিত ১৫৬
তথ্যসূত্র ১৫৯

গণিত নিয়ে কিছু কথা

গণিতকে সব বিজ্ঞানের জননী (Mother of Sciences) বলে। কিন্তু ঠিক করে গণিতের শুরু হয়েছে, তা আজও মানুষের অজ্ঞাত। তবে অনেকেরই ধারণা গণিতের শুরু ইতিহাসপূর্ব কালে।

গণিতের শুরু হয়েছে অনেকটা মানুষের মনের অজান্তেই। প্রাগৈতিহাসিককালে মানুষ যখন একাকি বনে-জঙ্গলে শিকার করতো, তখন তার অবস্থা একরকম ছিলো। কিন্তু মানুষ যখন থেকে দল বাঁধতে শুরু করলো, বলা যায়, ঠিক তখন থেকেই গণিত শুরু হয়েছে। মানুষ একজন থেকে দুজনে দল বেধেছে, দুজন থেকে তিনজন হয়েছে, তিনজন থেকে চারজন হয়েছে। এভাবেই মানুষ নিজেকে যুক্ত করে নিয়েছে গণিতের সাথে।

এভাবেই শুরু।

তারপর....।

কেটে গেছে বহুদিন।

গণিত ধীরে ধীরে তার পরিপূর্ণ অবয়ব লাভ করতে শুরু করে। ক্রমশই নিজেকে অন্য সকল জ্ঞানের ঊর্ধ্বে স্থাপন করে প্রবল প্রতাপশালী হিসেবে পরিগণিত করে তুলেছে। তবে এর পিছনে কাজ করে গেছেন অসংখ্য জানা-অজানা মানুষের কর্ম প্রচেষ্টা। একটি চলমান জ্ঞানের রথ চালনা করে গণিত এখনও, এই একবিংশ শতকেও রয়েছে একক, অনন্য এবং অসাধারণ একটি জ্ঞানের বিষয় হিসেবে। এখানে গণিতের ইতিহাস বিষয়ক কিছু কথা উল্লেখ করা হলো-

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৩০,০০০ অব্দ

প্যালিওলিথিক যুগের মানুষ পশুর হাড়ের উপর সংখ্যা গ্রোথিত করতে শুরু করে। ইউরোপ এবং ফ্রান্সে এই ধরনের সংখ্যা উৎকীর্ণ করার কাজ শুরু হয়।

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ২৫,০০০ অব্দ

প্রাথমিক পর্যায়ের জ্যামিতিক অঙ্কনের ব্যবহার শুরু হয়।

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৫,০০০ অব্দ

মিশরে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার শুরু হয়।

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৪,০০০ অব্দ

ব্যাবিলিনে প্রথমবারের মতো পঞ্জিকা (Calender) ব্যবহার শুরু হয়।

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৪,০০০ অব্দ

মিশরে প্রথমবারের মতো পঞ্জিকা (Calender) ব্যবহার শুরু হয়।

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৩,৪০০ অব্দ

মিশরে প্রথমবারের মতো সংখ্যা নির্ণায়ক প্রতীক, সরলরেখা, ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৩,০০০ অব্দ

মধ্যপ্রাচ্যে, বিশেষ করে ভূমধ্যসাগর এলাকায় অ্যাবাকাস (abacus) নামক গণক যন্ত্র তৈরি এবং ব্যবহারের কাজ শুরু হয়। অ্যাবাকাস শব্দটি এসেছে হিব্রু শব্দ অ্যাবাকা (abaca) থেকে, যার অর্থ 'ধূলিকণা'।

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৩,০০০ অব্দ

মিশরে প্রথমবারের মতো চিত্রলিপি বা হায়েরোগ্লিফিক (Hieroglyphic Numeral) শব্দ সংখ্যা ব্যবহার শুরু হয়। নিচে মিশরীয় হায়েরোগ্লিফিক সংখ্যার প্রতীক ও সেগুলোর অর্থ দেওয়া হলো–

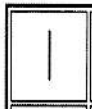	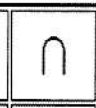	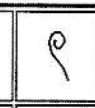	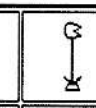	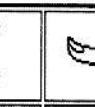	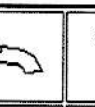		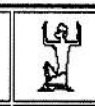
১	১০	১০০	১০০০	১০,০০০	১,০০,০০০	১০,০০,০০০	১০,০০০,০০০
উলম্ব রেখা	অশ্ব ক্ষুরাকৃতি	দড়ির কুণ্ডলি	পদ্ম ফুল	নির্দেশক আঙুল	বার্বট মাছ বা ব্যাঙাচি	আশ্চর্যান্বিত মানুষ	উদীয়মান সূর্য

মিশরীয় হায়েরোগ্লিফিক সংখ্যা ও প্রতীকের অর্থ

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৩,০০০ অব্দ

ব্যাবিলিয়নরা অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশের কাজ করার জন্য সেক্সাজেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি (sexagesimal number system) ব্যবহার করতে শুরু করে। এটি মূলত স্থান-মান পদ্ধতি (place-value system) যাতে শূন্যের কোনো স্থান নেই।

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ২,৭৭০ অব্দ

মিশরে পঞ্জিকা সংখ্যা ব্যবহার শুরু হয়।

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ২,০০০ অব্দ

হরপ্পাবাসীরা ওজন এবং পরিমাপের জন্য একইরকম দশমিক পদ্ধতি (uniform decimal system) ব্যবহৃত হতে থাকে।

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১,৯৫০ অব্দ

ব্যাবিলনীয়রা কোয়াড্রাটিক সমীকরণের (quadratic equations) সহজ সমাধান করেন।

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১,৯০০ অব্দ

মস্কো প্যাপিরাস (Moscow papyrus) লেখা হয়। একে গোলেনিশেভ প্যাপিরাসও (Golenishchev Papyrus) বলা হয়। এতে মিশরীয় জ্যামিতির একটি পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। বর্তমানেও এই প্যাপিরাস বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ আগ্রহের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

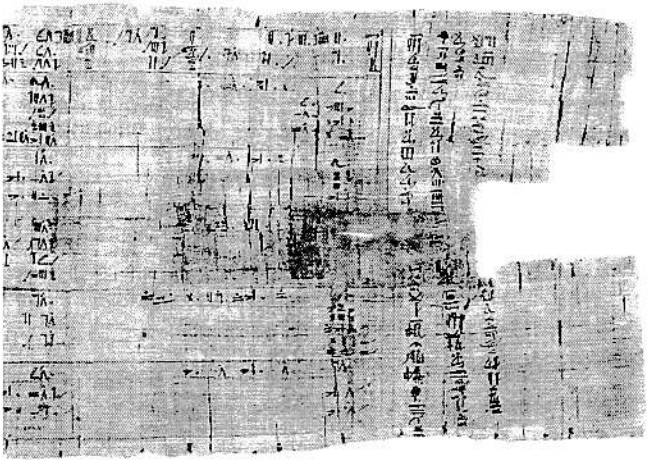

মস্কো প্যাপিরাস

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১,৮৫০ অব্দ

ব্যাবিলনীয়রা পিথারোগাসের উপপাদ্য (Pythagoras's Theorem) সম্পর্কে আগে থেকেই জানতেন। ব্যাবিলেনীয় ট্যাবলেটে উৎকীর্ণ লেখা থেকে জানা যায় যে, এই উপপাদ্য পিথাগোরাসের জন্মেরও ১০০০ বছর আগে প্রাচীন ইরাকে প্রচলিত ছিল। এখানে উল্লেখ্য পিথাগোরাস ৫৮২ খ্রিস্টপূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১,৮০০ অব্দ

ব্যাবিলনীয়রা নামতার (multiplication tables) ব্যবহার শুরু করে।

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১,৭৫০ অব্দ

ব্যাবিলনীয়রা রৈখিক এবং কোয়াড্রেট সমীকরণের সমাধান করতে সক্ষম হন। এসময় তারা বর্গমূল এবং ঘনমূলের বিভিন্ন ধরনের সারণি তৈরি করতে শুরু

করেন। তারা এসময় ব্যাবিলনীয় পিথাগোরাসের উপপাদ্য ব্যবহার করতে শুরু করে এবং গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণের জন্য গণিত ব্যবহার করতে শুরু করে।

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১,৭০০ অব্দ

এসময় রাইন্ড প্যাপিরাস (Rhind Papyrus) লিখিত হয়। একে অ্যাহোমস্ প্যাপিরাসও (A'h-mosè Papyrus) বলা হয়। এই প্যাপিরাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য মিশরীয় গণিতে নানা ধরনের কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছিল। পর পর দ্বিগুণত্ব এবং পর পর অর্ধ্বত্বের উপর ভিত্তি করেই নামতার বিন্যাস করা হয়।

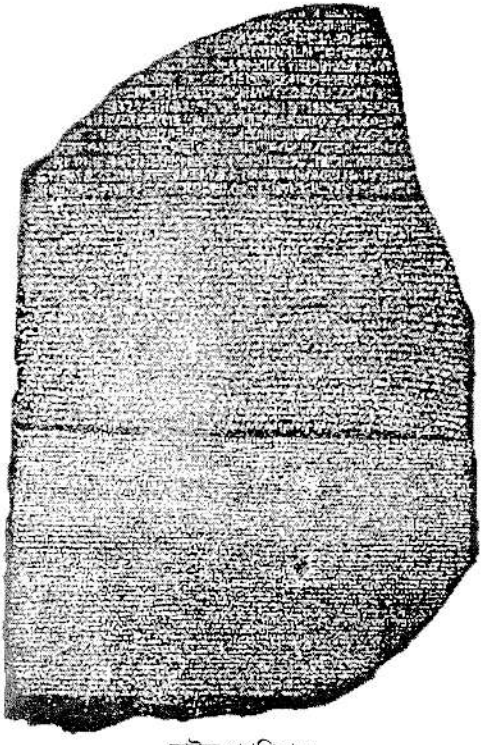

রাইন্ড প্যাপিরাস

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১,৪০০ অব্দ

ঐতিহাসিকভাবে এসময় থেকেই চীনে শূন্যবিহীন দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ

ভারতে বৌধিয়ানা (Baudhayana) নামে একজন গণিতবিদ প্রথম ভারতীয় সুল্বসূত্র (Indian Sulbasutras) প্রণয়ন করেন।

বৌধিয়ানা

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০ অব্দ

মানাভা (Manava) নামক গণিতবিদ সুল্বসূত্র প্রণয়ন করেন। এই বিশেষ ধরনের সূত্র ভারতীয় গণিত শাস্ত্রকে অনেক উঁচু স্তরে উন্নীত করতে সহায়তা করে।

মানাভা

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ

অ্যাপস্টম্বা (Apastamba) নামক ভারতীয় গণিতবিদ এমন একটি সুল্বসূত্র প্রণয়ন করেন, যা গণিতের দৃষ্টিতে অতুলনীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

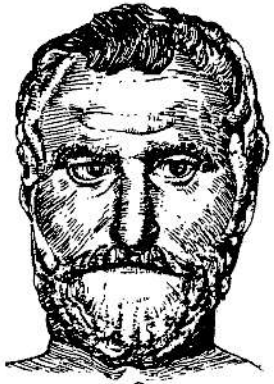

থেলিস

খ্রিস্টপূর্ব ৫৭৫ অব্দ

গ্রিক বিজ্ঞানী থেলিস (Thales) ব্যাবিলনীয় গণিতশাস্ত্রকে গ্রিসে নিয়ে আসেন। তিনি পিরামিডের উচ্চতা এবং তীরভূমি থেকে সাগরে জাহাজের দূরত্ব পরিমাপের জ্যামিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে শুরু করেন।

খ্রিস্টপূর্ব ৫৩০ অব্দ

গ্রিসের সামেয়াবাসী পিথাগোরাস (Pythagoras of Samoa) ইতালির ক্রোটনে গমন করে সেখানে গণিত শাস্ত্র, জ্যামিতি ও জন্মান্তর সম্পর্কে শিক্ষকতা শুরু করেন।

সামেয়াবাসী পিথাগোরাস

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দ

ব্যাবিলনীয় সেক্সাজেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে সূর্য, চন্দ্র এবং বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান, স্থানাংক, ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য ব্যবহার এবং সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার কাজ শুরু হয়।

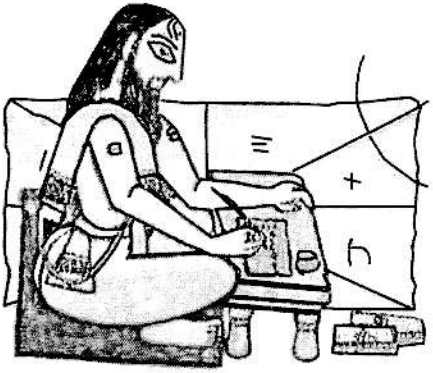

পানিনি

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০ অব্দ

ব্যাকরণবিদ ও গণিতজ্ঞ পানিনি (Panini) সংস্কৃত ব্যাকরণের উপর তার কাজ শুরু করেন, যা আধুনিক প্রচলিত ভাষাতত্ত্বের মূল ভিত্তি গড়ে দেয়। তিনি ভাষার বর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রে গাণিতিক নিয়ম প্রচলন করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ পানিনিয়াম (Paniniyam)–এ তিনি এই বিন্যাস লিপিবদ্ধ করেন।

কম্পিউটার নিয়ে কিছু কথা

কম্পিউটারকে আধুনিক বিজ্ঞানের একমাত্র সঙ্গী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানকালে কম্পিউটার মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার জগৎকে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু কম্পিউটারের প্রাচীন ইতিহাস এবং কিভাবে তা মানুষের অনুষঙ্গী হয়েছে উঠেছে, সে বিষয়ে অনেকেরই ধারণা নেই। তবে গণিতের মতোই কম্পিউটার বিষয়ক ধারণা মানুষের মনে অনেক আগেই স্থান করে নিয়েছিল, যদিও তা বর্তমানকালের মতো নয়। কম্পিউটার কিভাবে মানুষের সঙ্গী হয়ে উঠেছে সে সম্পর্কে এখানে কালানুক্রমিক ধারণা দেওয়া হলো--

খ্রিস্টপূর্ব ৬০০

প্রাচীন চীনে অ্যাবাকাস আবিষ্কৃত হয়। একে বলা হতো সুয়ান পান (Suan Pan)। পরবর্তীকালে এটি জাপান ও রাশিয়ায় নিজের স্থান করে নেয়। জাপানে এটি সরোবান (Soroban) এবং রাশিয়ায় এটি স্ক'টিয়া (Scortia) নামে পরিচিতি লাভ করে।

খ্রিস্টাব্দ ৬০০

আরব দেশসমূহে বিভিন্ন গাণিতিক সংখ্যার ব্যবহার দেখা যায়। ভারতে শূন্য আবিষ্কৃত হয়। ভারতীয় গণিতবিদদের বিভিন্ন গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হতে থাকে। এর ফলে গাণিতিক সংখ্যাগুলো ইউরোপিয়ানদের নজরে আসতে থাকে।

খ্রিস্টাব্দ ১০০০

আরবীয় সংখ্যা স্পেন হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করতে শুরু করে।

খ্রিস্টাব্দ ১৩০০

ইতালিয়ান বণিক শ্রেণির কাছে গাণিতিক এসব সংখ্যা জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এর আগে পশ্চিম ইউরোপে রোমান গাণিতিক সংখ্যাই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। অন্যদিকে প্রাচ্যে গ্রিক গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহার করা হতো। উত্তর ভারতে আধুনিক দেবনাগরী সংখ্যার অনুরূপ গাণিতিক সংখ্যা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। সংখ্যাগুলো ছিল নিচে দেওয়া হলো–

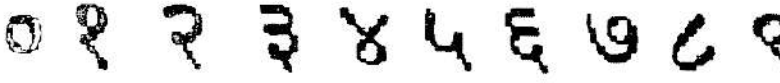

খ্রিস্টাব্দ ১৪৮৮

জোহানেস গুটেনবার্গ (Johannes Gutenberg) নড়নক্ষম টাইপযুক্ত ছাপার মেশিন (moveable-type printing press) আবিষ্কার করেন। তাঁর এই আবিষ্কার মানুষের চিন্তার রাজ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের চিন্তা-ভাবনা যা লিখিত আকারে বের হয়, তা মুদ্রিত আকারে অনেক মানুষের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এটি যুগান্তকারী প্রভাব বিস্তার করে, যা এর আগে চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না।

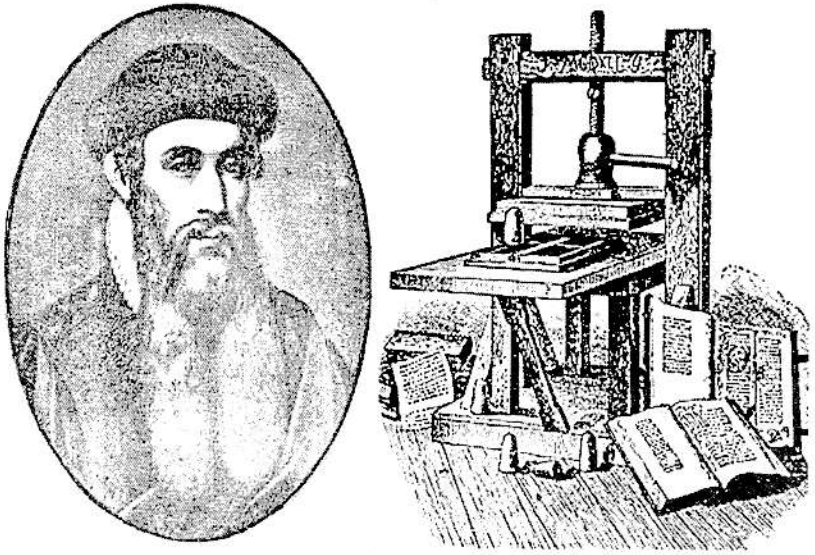

জোহানেস গুটেনবার্গ ও তাঁর আবিষ্কৃত প্রিন্টিং প্রেস

খ্রিস্টাব্দ ১৪৯২

নাইস-এর ফ্রান্সিস পেলোস (Francis Pellos of Nice) দশমিক বিন্দু (decimal point) আবিষ্কার করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৬০০

থমাস হ্যারিয়ট (Thomas Harriot) বীজগণিতের প্রতীক আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথমবারের মতো চাঁদের মানচিত্র প্রণয়ন করেন এবং সূর্যের কলঙ্ক আবিষ্কার করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৬০০

ড. উইলিয়াম গিলবার্ট (Dr. William Gilbert) স্থির বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেন, যা পরবর্তীকালে মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

খ্রিস্টাব্দ ১৬১৪

জন নেপিয়ার (John Napier, ১৫৫০-১৬১৭) লগারিদম (logarithm) আবিষ্কার করেন। এই লগারিদম জ্যোতিবিদ্যা, নৌচালনা, গাণিতিক হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। তিনি হাতির পেছনের পায়ের হাড় দিয়ে এক ধরনের গণক যন্ত্রও তৈরি করেন। মোট ১১টি দণ্ডাকার দাগকাটা অস্থি দিয়ে এই গণক যন্ত্রটি নেপিয়ারের অস্থি (Napier's Bone) নামেই পরিচিতি লাভ করে। লগারিদমের কথা আগে জানা গেলেও নেপিয়ারের অস্থির কথা জানা যায় আবিষ্কারকের মৃত্যুর পর।

জন নেপিয়ার

খ্রিস্টাব্দ ১৬২২

উইলিয়াম অউটরেড (William Oughtred) স্লাইড রুল (slide rule) আবিষ্কার করেন। বিভিন্ন ধরনের হিসাব-নিকাশের কাজে এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়।

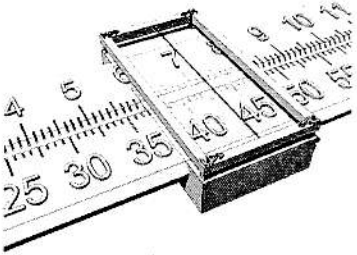

স্লাইড রুল

খ্রিস্টাব্দ ১৬২৩

উইলিয়াম শিকার্ড (Wilhelm Schickard) গণক ঘড়ি (Calculating Clock) নামে এক বিশেষ ধরনের ঘড়ি বা সময় পরিমাপক যন্ত্র তৈরি করেন।

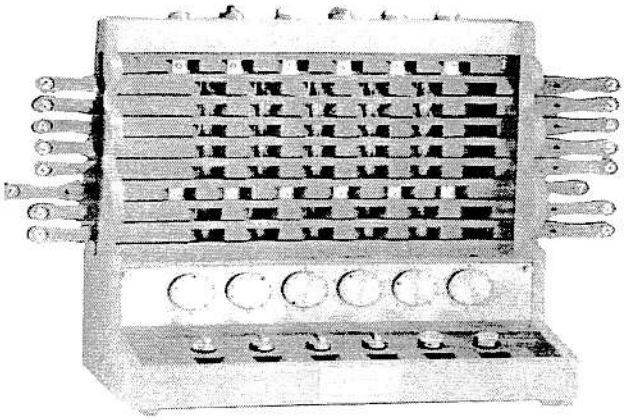

গণক ঘড়ি

খ্রিস্টাব্দ ১৬৪৪-৪৫

তরুণ ফরাসি গণিতবিদ ব্লেইজ প্যাসকেল (Blaise Pascal) প্যাসকেলাইন (Pascaline) নামক একটি গণক যন্ত্র তৈরি করেন। এই যন্ত্র দিয়ে যোগ করার কাজ করা যেতো। বেশ কয়েকটি দাঁতযুক্ত চক্র (toothed wheel) পাশাপাশি বসিয়ে তিনি এই যন্ত্র তৈরি করেন। প্রতিটি চক্রের প্রান্তভাগে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত দাগ-কাটা ছিলো।

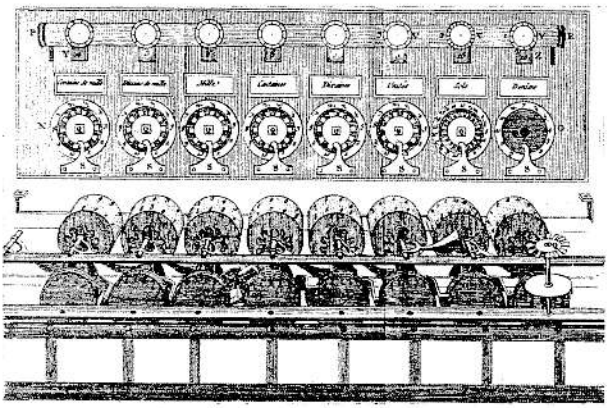

প্যাসকেলাইন : উপরে : উপরের দৃশ্য নিচে : যন্ত্রাংশ

খ্রিস্টাব্দ ১৬৬০

অটো ফন গুয়েরক (Otto von Gürcke) বৈদ্যুতিক যন্ত্র (electric machine) তৈরি করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৬৭৪

স্বনামধন্য দার্শনিক গটারফ্রিড উইলহেলম ফন লেইবনিজ (Gottfried Wilhelm von Leibniz) প্যাসকেলাইনের অনুরূপ পর্যায়িক গণনযন্ত্র (Stepped Reckoner) তৈরি করেন। এই যন্ত্র তৈরিতে তাঁকে সাহায্য করেন প্যারিসের অলিভিয়ার (Olivier) নামক এক ব্যক্তি। এই যন্ত্র দিয়ে গুণ ও ভাগ করারও ব্যবস্থা করা হয়। লেইবনিজ ক্যালকুলাসের সহ-আবিষ্কর্তা হিসেবেও খ্যাত।

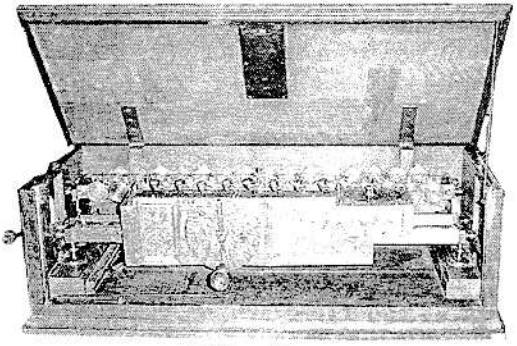

পর্যায়িক গণনযন্ত্র

খ্রিস্টাব্দ ১৭৫২

বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন (Benjamin Franklin) আকাশে বিদ্যুৎ চমকানো থেকে বজ্রপাত সংগ্রহ করার কাজে সমর্থ হন।

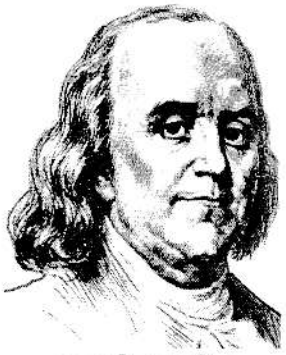

বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন

খ্রিস্টাব্দ ১৭৮৬

জার্মান সেনাবাহিনীর (Hessian Army) জে. এইচ. মুলার (J. H. Müeller) দুই-এর চেয়ে বেশি সংখ্যাবিশিষ্ট গণিতের জন্য গণক যন্ত্র তৈরির চেষ্টা করেন,

যার নাম দিয়েছিলেন ডিফারেন্স ইঞ্জিন (difference engine)। কিন্তু অর্থের অভাবে তাঁর এই প্রচেষ্টা ভেস্তে যায়।

খ্রিস্টাব্দ ১৭৯০

গ্যালভানি (Galvani) বিদ্যুৎ প্রবাহ আবিষ্কার করেন এবং তা ব্যাঙের পা'–এর সাথে লাগিয়ে পরখ করেন।

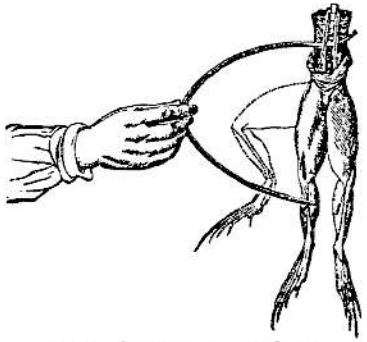

গ্যালভানির ব্যাঙের পা পরীক্ষা

খ্রিস্টাব্দ ১৮০০

আলেসান্দ্রো ভোল্টা (Alessandro Volta) আধুনিক ব্যাটারির (battery) পূর্বপুরুষ ভল্টেইক পাইল (Voltaic pile) তৈরি করেন।

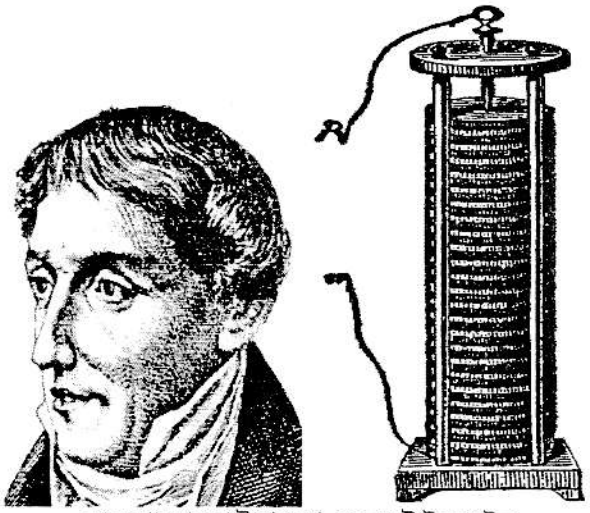

আলেসান্দ্রো ভোল্টা (বামে) ও ভোল্টোইক পাইল

খ্রিস্টাব্দ ১৮০১

ফ্রান্সের তাঁতশিল্পী জোসেফ মেরি জ্যাকার্ড (Joseph Marie Jacquard) পাঞ্চর্ড কার্ড সিস্টেম (punch card system) আবিষ্কার করেন, যা তিনি নিজের তাঁত কারখানার হিসাব-নিকাশের কাজে ব্যবহার করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই পাঞ্চড কার্ড বা সচ্ছিদ্রল কার্ড অন্য অনেক ধরনের গণক যন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

জোসেফ মেরি জ্যাকার্ড

খ্রিস্টাব্দ ১৮০৯

স্যার হামফ্রে ডেভি (Sir Humphry Davy) বৈদ্যুতিক আর্ক বাতি (electric arc lamp) আবিষ্কার করেন।

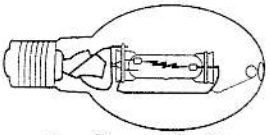

বৈদ্যুতিক আর্ক বাতি

খ্রিস্টাব্দ ১৮২০

ফ্রান্সের চার্লস জেভিয়ার থমাস দ্য কলমার (Charles Xavier Thomas de Colmar) গণন-যন্ত্র অ্যারিথমোমিটার (Arithmometer) আবিষ্কার করেন। লেইবনিজ গণন-যন্ত্রে যে ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল, নিজের যন্ত্রেও কলমার একই পদ্ধতি ব্যবহার করেন। সেসময়ের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও বিশালকার এই গণন-যন্ত্র প্রায় ৯০ বছর ধরে মানুষের কাছে বিক্রয় করা হয়েছে। এই যন্ত্র দিয়ে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করার কাজ করা যেতো।

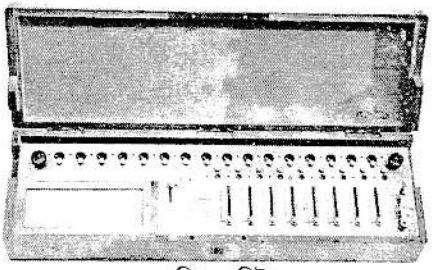

অ্যারিথমোমিটার

খ্রিস্টাব্দ ১৮২২-২৩

ব্রিটিশ গণিতবিদ চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage) সরকারি অর্থায়নে ডিফারেন্স ইঞ্জিন (Difference Engine) নামক গণক-যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্র দিয়ে তিনি সাধারণ বীজগাণিতিক সমস্যা সমাধানের চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই যন্ত্র তিনি চালু করতে পারেননি।

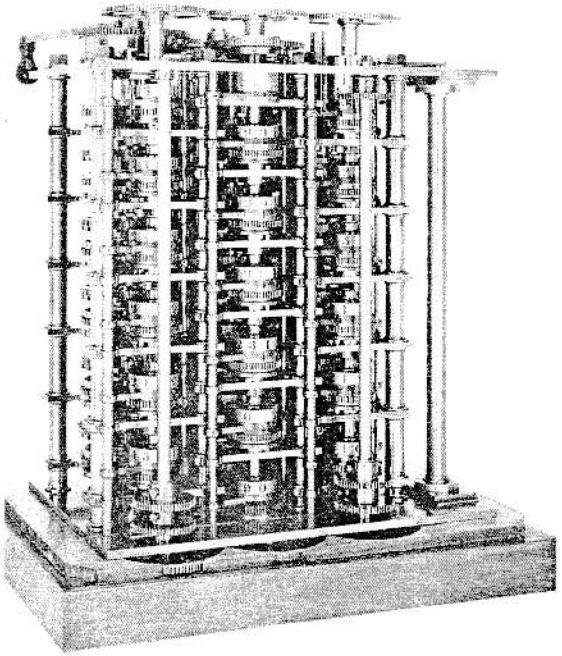

ডিফারেন্স ইঞ্জিন

চার্লস ব্যাবেজের ছাত্রী এবং লর্ড বায়রনের কন্যা অ্যাডা লাভলেস (Adda Lovelace, ১৮১৫ – ১৮৫২) নিজ শিক্ষকের কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে

পেরেছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে ধারণা দেন যে, এক ধরনের যান্ত্রিক ভাষা ছাড়া এই মেশিন চালু করা যাবে না। এজন্য তিনি বাইনারি ডিজিট ০ এবং ১ ব্যবহার করে এক ধরনের ভাষার উদ্ভাবন করেন।

অ্যাডা লাভলেস

খ্রিস্টাব্দ ১৮২৫

সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য রেলওয়ে খুলে দেওয়া হয়।

খ্রিস্টাব্দ ১৮২৬

বেনোয় ফোরনেইরন (Benoit Fourneyron) ফটোগ্রাফি আবিষ্কার করেন।

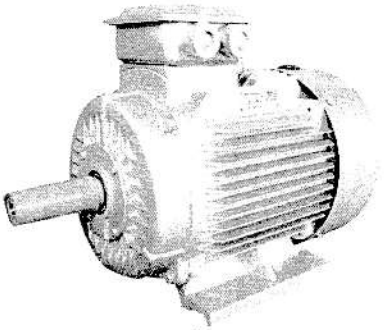

মোটর

খ্রিস্টাব্দ ১৮৩০

ভারমন্টের থমাস ডেভেনপোর্ট (Thomas Davenport of Vermont) ইলেকট্রিক মোটর (electric motor) আবিষ্কার করেন। তিনি একে খেলনা বলতেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৮৩১

মাইকেল ফ্যারাডে (Michael Faraday) প্রথমবারের মতো জেনারেটর (generator) ব্যবহার করে বিদ্যুৎ তৈরি করেন।

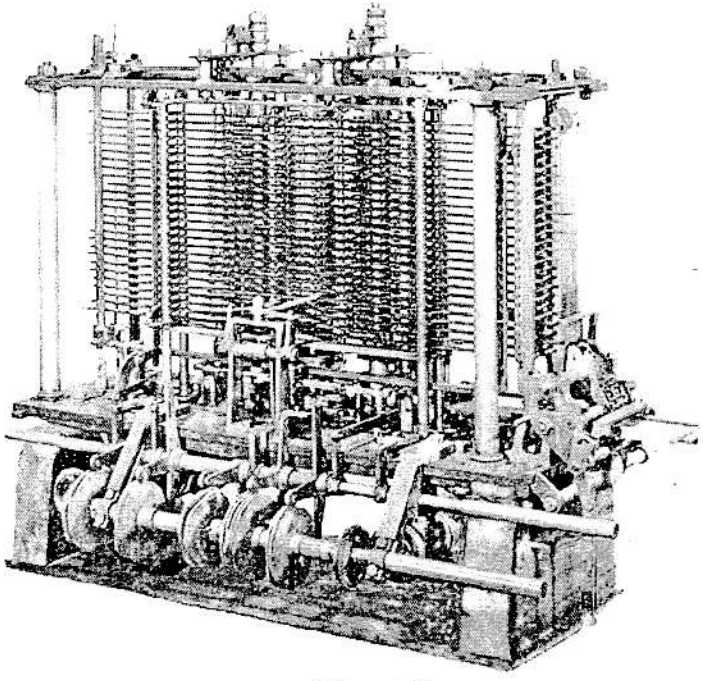

অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন

খ্রিস্টাব্দ ১৮৩২-৩৪

চার্লস ব্যাবেজ প্রথমবারের মতো প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর (programmable calculator) হিসেবে অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন (Analytical Engine) আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। পূর্বের মতো এবার তিনি সরকারি অর্থানুকুল্য পাননি। এই যন্ত্রটি তৈরি করার জন্য তিনি যে সংগঠন-চিত্রটি উদ্ভাবন ও ব্যবহার করেন, মূলত তার উপর ভিত্তি করেই আধুনিককালের যাবতীয় কম্পিউটার তৈরি করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এই যন্ত্রটিও চালু করতে পারেননি।

খ্রিস্টাব্দ ১৮৩৭

স্যামুয়েল ফিনলে ব্রিজ মোর্স (Samuel Finley Breese Morse) টেলিগ্রাফ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

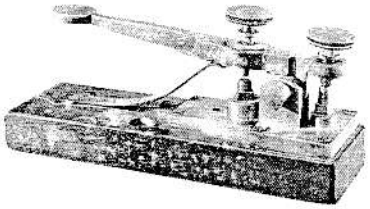

টেলিগ্রাফ যন্ত্র

খ্রিস্টাব্দ ১৮৬৮

মিলওয়াইকি'র ক্রিস্টোফার ল্যাথাম শোলে (Christopher Latham Sholes) প্রথম মতো বাণিজ্যিক টাইপরাইটার (commercial typewriter) তৈরি করেন।

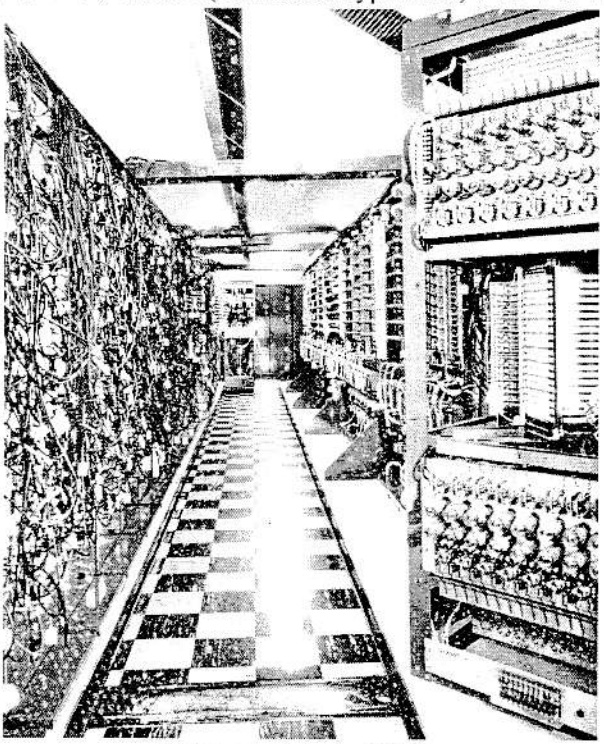

লার্জ স্কেল অ্যানালগ কম্পিউটার

খ্রিস্টাব্দ ১৮৭২

লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin) প্রথমবারের মতো লার্জ স্কেল অ্যানালগ কম্পিউটার (large-scale analog computer) তৈরি করেন। সরকারের বিশেষ নির্দেশক্রমে

তিনি যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন। এই যন্ত্র দিয়ে তিনি ইংলিশ বন্দরের ঢেউয়ের উচ্চতা পরিমাপ করার কাজ করতেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৮৭৬

আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল (Alexander Graham Bell) টেলিফোন বা দূরভাষ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে এই যন্ত্রটি কম্পিউটার প্রযুক্তিতে নানাভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

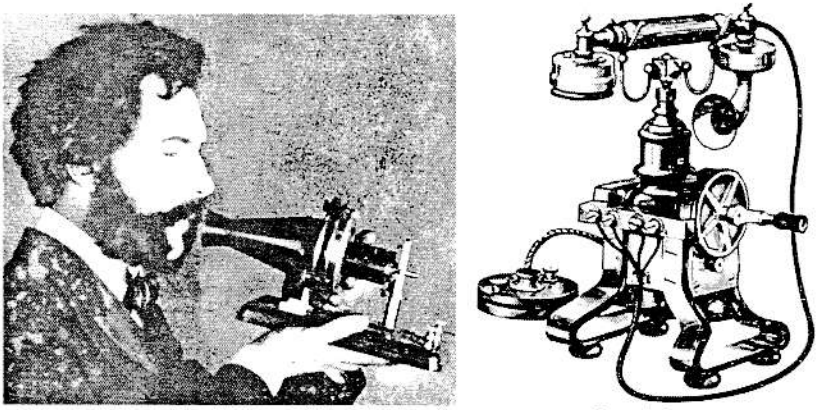

আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল স্বআবিষ্কৃত টেলিফোনসহ (বামে) আধুনিক টেলিফোন (ডানে)

খ্রিস্টাব্দ ১৮৭৭

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী থমাস আলভা এডিসন (Thomas Alva Edison) গ্রামোফোন আবিষ্কার করেন।

থমাস আলভা এডিসন

খ্রিস্টাব্দ ১৮৮১

চার্লস এস. টেইনটার (Charles S. Tainter) প্রথমবারের মতো ডিক্টাফোন (dictaphone) আবিষ্কার ও ব্যবহার করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৮৮৬

শিকাগোর ডর ইউজিন ফেল্ট (Dorr Eugene Felt) কম্পোমিটার (Comptometer) নামক একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এটি চাবিযুক্ত প্রথম গণন-যন্ত্র হিসেবে পরিচিত। অবশ্য সাথে মুদ্রণ যন্ত্র বা প্রিন্টার না থাকার কারণে এটি দীর্ঘদিন মানুষের চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়।

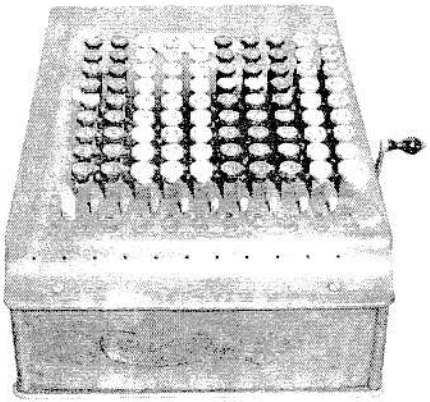

কম্পোমিটার

খ্রিস্টাব্দ ১৮৮৭

ইতিয়েনে জুলস মেরে (Etienne Jules Marey) গতিচিত্র তোলার ক্যামেরা (Motion Picture Camera) আবিষ্কার করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৮৮৭

ইস্টম্যান (Eastman) প্রথমবারের মতো নিজের আবিষ্কৃত বাক্স ক্যামেরার প্যাটেন্ট করেন। মূলত এর মাধ্যমেই গতিচিত্র বা চলমান চিত্রগ্রহণের কাজ পেশাজীবিদের কাছ থেকে সাধারণ মানুষের কাছে চলে আসে।

খ্রিস্টাব্দ ১৮৯০

এমআইটি–এর প্রকৌশলী হারম্যান হোলারিথ (Herman Hollerith) পাঞ্চ কার্ড টেবুলেটিং মেশিন (tabulating machine) নির্মাণের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন করেন। এটি এই বছরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত আদমশুমারির কাজে সরাসরি ব্যবহার করা হয়। টেবুলেটিং মেশিনের পাঞ্চর্ড জ্যাকার্ড উদ্ভাবিত পাঞ্চড কার্ড

বৈদ্যুতিকভাবে ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীকালে তিনি এই টেবুলেটিং মেশিন ব্যবহার বাণিজ্যিকীকরণের জন্য টেবুলেটিং মেশিন কোম্পানি (Tabulating Machine Company) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। আরো পরে এই মেশিন কোম্পানি এবং সহযোগী কোম্পানিসমূহ একত্রিত হয়ে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন বা আইবিএম নামক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেন।

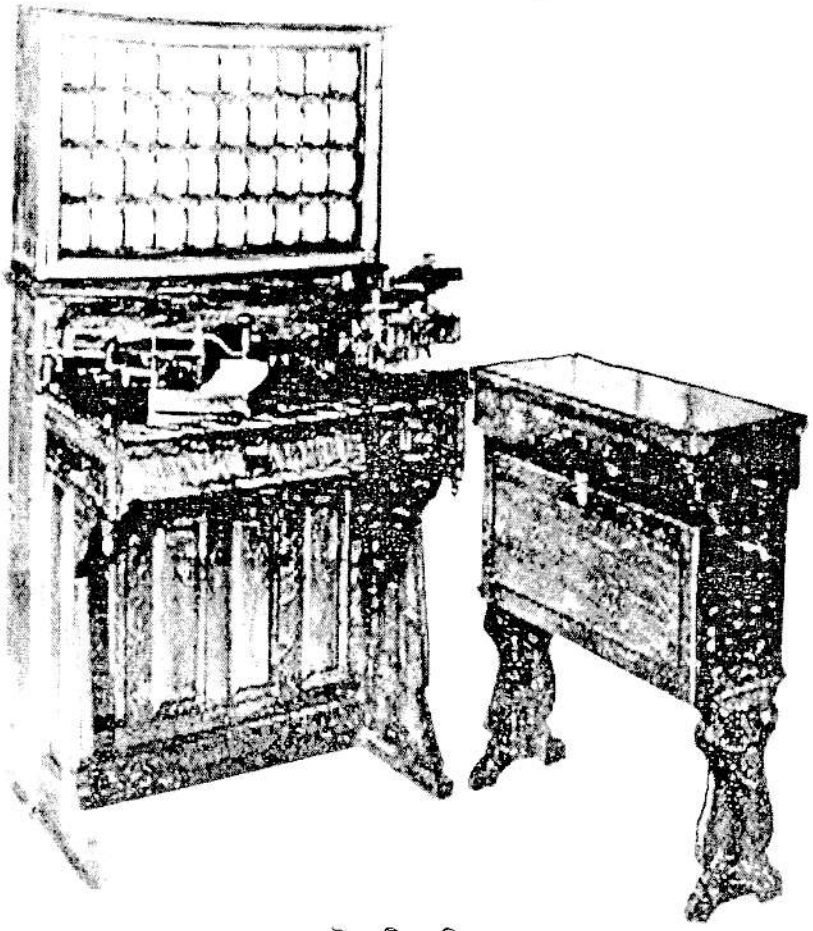

টেবুলেটিং মেশিন

খ্রিস্টাব্দ ১৮৯১

থমাস আলভা এডিসন গতিচিত্র প্রক্ষেপক যন্ত্র (Motion Picture Projector) আবিষ্কার করেন। এতে তিনি কার্বন আর্ক বাতি ব্যবহার করেন।

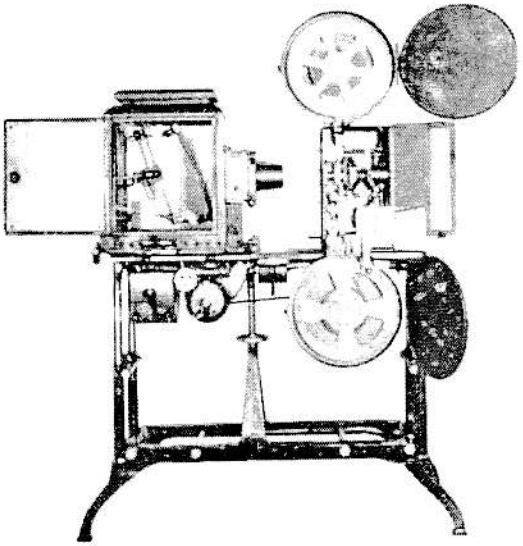

গতিচিত্র প্রক্ষেপক যন্ত্র

খ্রিস্টাব্দ ১৮৯৬

কাউন্ট গুগলিয়েলমো মার্কনি (Guglielmo Marconi, ১৮৭৪-১৯৩৭) রেডিও টেলিগ্রাফ (Radio Telegraph) আবিষ্কার করেন।

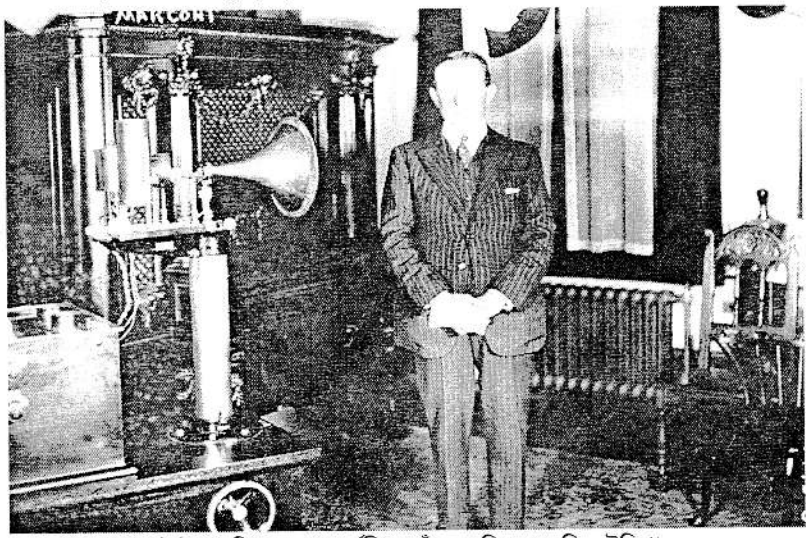

কাউন্ট গুগলিয়েলমো মার্কনি ও তাঁর আবিষ্কৃত রেডিওটেলিগ্রাফ

খ্রিস্টাব্দ ১৮৯৯

ভ্যাল ডেমার পউলসেন (Val Demar Poulsen) চৌম্বকীয় রেকর্ডার (Magnetic Recorder) আবিষ্কার করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯০০

রেনে গ্রাফেন (Rene Graphen) ফটোকপি করার যন্ত্র (Photocopying Machine) আবিষ্কার করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯০১

রেজিনাল্ড এ. ফেসেনডেন (Reginald A. Fessenden) রেডিও টেলিফোন (Radio Telephone) তৈরি করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯০৬

কম্পিউটারের জনক চার্লস ব্যাবেজ–এর ছেলে হেনরি ব্যাবেজ আর. ডব্লিউ. মুনরো'র খামারের সহায়তায় অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিনের উপর কাজ শুরু করেন। তাঁর কাজের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো যে, সবার কাছে প্রমাণ করা যে যন্ত্রটি আসলেই কাজের।

খ্রিস্টাব্দ ১৯১৩

থমাস আলভা এডিসন (Thomas Alva Edison) প্রথমবারের মতো কথা-বলা গতিচিত্র আবিষ্কার করেন।

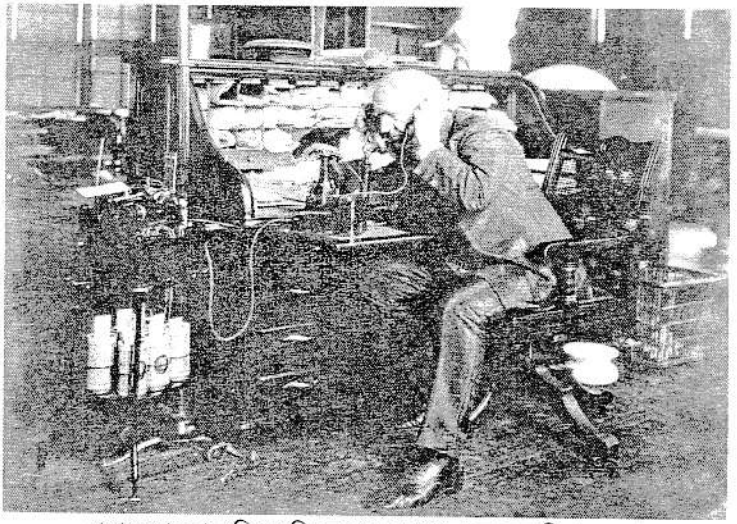

থমাস আলভা এডিসন নিজের গবেষণাগারে বসে আবিষ্কারে মগ্ন

খ্রিস্টাব্দ ১৯১৯

ডব্লিউ. এইচ. একক্লিস (W. H. Eccles) এবং এফ. ডব্লিউ. জর্ডান (W. H. Eccles and F. W. Jordan) প্রথমবারের মতো ফ্লিপ-ফ্লপ সার্কিট ডিজাইন (Flip-flop circuit design) প্রকাশ করেন।

অল-ইলেকট্রিক ফোনোগ্রাফ

খ্রিস্টাব্দ ১৯২৫

জে. পি. ম্যাক্সফিল্ড (J. P. Maxfield) অল-ইলেকট্রিক ফোনোগ্রাফ (All-electric Phonograph) আবিষ্কার করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯২৭

ফিলো টি. ফ্রান্সওর্থ (Philo T. Farnsworth) প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে টেলিভিশন প্রদর্শন করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৩০

প্রথমবারের মতো বড়ো আকারের অ্যানালগ কম্পিউটার (analog computer) তৈরি করা হয়।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৩৩

আইবিএম প্রথম বাণিজ্যিক ইলেকট্রিক টাইপরাইটার (Electric Typewriter) সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উপস্থাপন করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৩৩

এডউইন এইচ. আর্মস্ট্রং (Edwin H. Armstrong) এফ এম রেডিও (FM Radio) তৈরি করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৩৬

রবার্ট এ. ওয়াটসন ওয়াট (Robert A. Watson Watt) রাডার (Radar) তৈরি করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৩৬

বেঞ্জামিন বুরাক (Benjamin Burack) প্রথমবারের মতো বৈদ্যুতিক লজিক মেশিন (electric logic machine) তৈরি করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৩৯

আইওয়া স্টেট কলেজের জন ভি. অ্যাটানাসফ (John V. Atanasoff) ও গ্র্যাজুয়েট ছাত্র ক্লিফোর্ড বেরি (Clifford Berry) একটি প্রোটোটাইপ ১৬-বিট অ্যাডার (16-Bit Addar) তৈরির কাজ সম্পন্ন করেন। এটি ভ্যাকুয়াম টিউব (vacuum tube) ব্যবহার করে তৈরি করা প্রথম গণনাকারী মেশিন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৪১

জার্মান অ্যারোনটিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (German Aeronautical Research Institute) সাহায্যপুষ্ট বিজ্ঞানী জুসে (Zuse) বিশ্বের প্রথমবারের মতো কার্যকর প্রোগ্রামযোগ্য (Operational Programmable Calculator V3) ক্যালকুলেটর V3 তৈরি করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৪৩

হাওয়ার্ড এইচ. আইকেন এবং তাঁর সহযোগীরা ক্যামব্রিজের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে ASCC Mark I নামক কম্পিউটারটি তৈরি করেন। এর পুরো নাম হচ্ছে অটোমেটিক সিকোয়েন্স কন্ট্রোলড ক্যালকুলেটর মার্ক ১ (Automatic Sequence-Controlled Calculator Mark 1)। এটি নির্মাণের জন্য সরাসরি অর্থ সাহায্য করে আইবিএম নামক কম্পিউটার প্রতিষ্ঠান। বিপুলায়তন এই যন্ত্রটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম বাইনারি কম্পিউটার হিসেবে পরিচিত, যেটি পরিচালানা করার জন্য বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করা হতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ধরনের গবেষণা কাজ পরিচালনা করার জন্য এই কম্পিউটারটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতো। সেসময়কার অনেক গবেষকই এই কম্পিউটার ব্যবহার করে নিজেদের হিসাব-নিকাশের কাজ সম্পন্ন করেছেন।

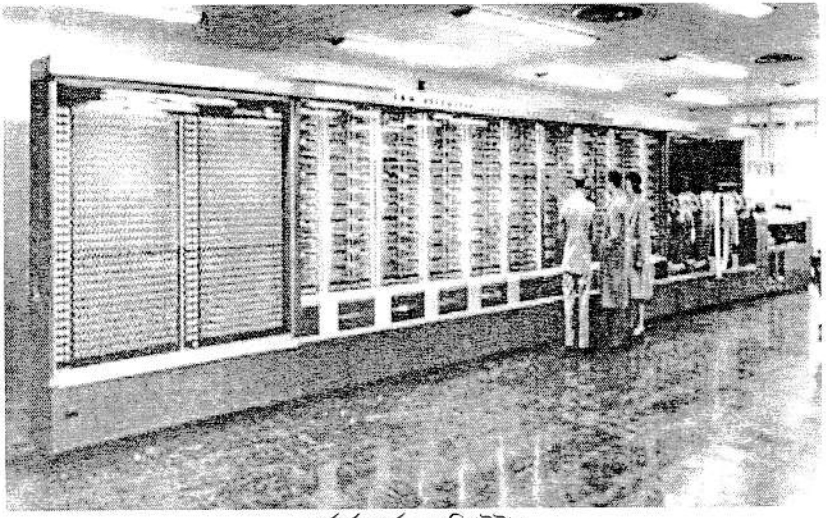

হার্ভার্ড মার্ক ১ কম্পিউটার

খ্রিস্টাব্দ ১৯৪৫

জন ভন নিউম্যান (John von Neumann) এক বিশেষ ধরনের কম্পিউটারের ধারণা দেন। একে ভন নিউম্যান কম্পিউটার (von Neumann computer) নামে অভিহিত করা হয়। এটি মূলত এক ধরনের স্টোরড-প্রোগ্রাম কম্পিউটার (stored-program computer)।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৪৫

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন ডব্লিউ. মউসলে (John W. Mauchly) এবং জে. প্রেসপার (J. Presper Eckert) এবং তাঁদের দল মার্কিন সেনাবাহিনীর ব্যালিস্টিক রিসার্চ ল্যাবের জন্য একটি গোপণীয় প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছিলেন। এই প্রজেক্টেই তারা তৈরি করেন এনিয়াক (ENIAC) নামের এক বিশেষ ধরনের যন্ত্র। এনিয়াক শব্দের পূর্ণ অর্থ হলো ইলেকট্রনিক নিউমেরিক্যাল ইনটিগ্রেটর এন্ড ক্যালকুলেটর (Electronic Numerical Integrator and Calculator)। এই যন্ত্রটির ওজন ছিলো ৩০ টন, উচ্চতায় ছিলো ১৮ ফুট এবং লম্বায় ছিলো প্রায় ৮০ ফুট। এটি মেঝের প্রায় ১০০০ বর্গফুট জায়গা জুড়ে ছিলো। চালু করার জন্য এই যন্ত্রে ১৩০ থেকে ১৪০ কিলোওয়াট শক্তির প্রয়োজন হতো। এতে ১৭,৪৬৮টি ভ্যাকুয়াম টিউব এবং প্রায় ৫ লক্ষ সংযোগ। এটি তৈরি করার জন্য সেই সময়ই প্রয়োজন হয়েছিলো প্রায় ৪,৮৭,০০০ ডলার। এটি প্রতি সেকেন্ডে পাঁচ হাজার যোগ করতে পারতো। সবচেয়ে মজার

বিষয় হলো, এনিয়াক যা কাজ করতো, তা করার জন্য বর্তমানকালের যন্ত্রপাতির আকার অনেকটা তাস খেলার কার্ডের মতো হলেই চলবে।

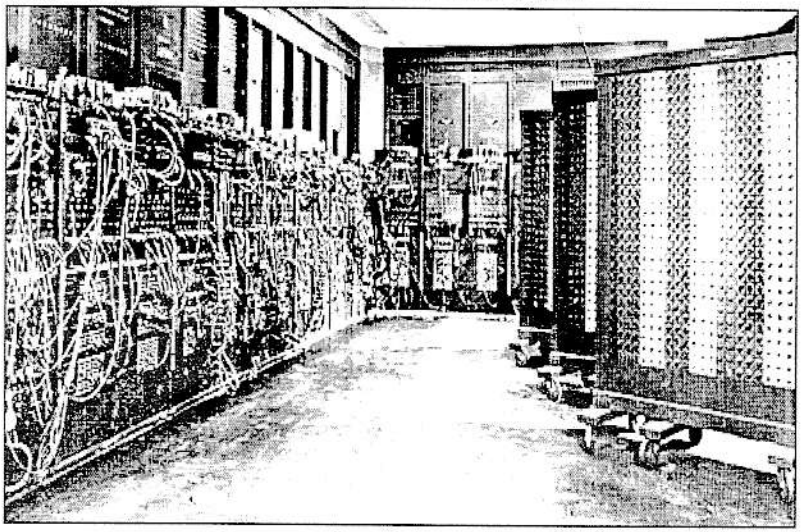

এনিয়াক কম্পিউটার

বর্তমানকালের কম্পিউটার এনিয়াকের তুলনায় প্রায় ৫০ হাজার গুণ দ্রুত এবং এনিয়াক যতটুকু তথ্য ধারণ করতে পারতো, তার চেয়ে প্রায় ১০ লক্ষ বা তার চেয়েও বেশি তথ্য ধারণ করতে পারে। এনিয়াকের ঘড়ির গতি ছিলো মাত্র ১০০ কিলোহার্টজ।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৪৫

এই বছরের ক্রিসমাস বা বড়দিনের ঠিক দুদিন আগে ট্রানজিস্টরকে কাজ করার উপযোগী হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৪৬

কনরাড জুসে (Konrad Zuse) বাভারিয়াতে আত্মগোপন করে থাকার সময় বিশ্বের প্রথম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্ল্যানকালকুল (Plankalkul) প্রণয়ন করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৪৬

এনিয়াক (ENIAC) কম্পিউটার মানুষের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এর সাথে বৈদ্যুতিক বাতির একটি প্যানেল বসানো হয়, যাতে সংবাদদাতার বুঝতে পারেন কম্পিউটারটি কত দ্রুত চলছে এবং এটি কি কাজ করছে।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৪৭

একসাথে অনেকজন বিজ্ঞানী চৌম্বকীয় ড্রাম মেমোরি (magnetic drum memory) আবিষ্কার করেন।

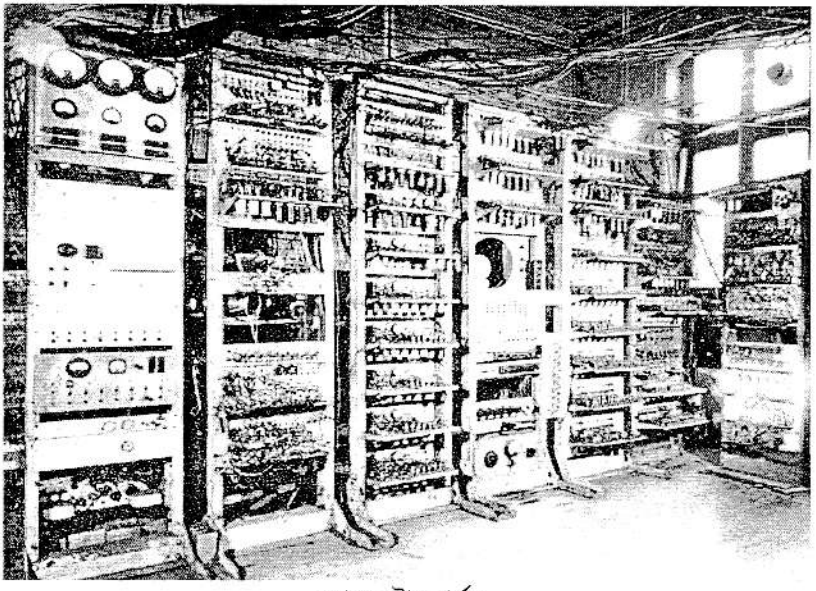

ম্যানচেস্টার মার্ক ১

খ্রিস্টাব্দ ১৯৪৮

ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের পল নিউম্যান, ফ্রেডি উইলিয়ামস ও তাঁদের সহযোগীরা 'ম্যানচেস্টার মার্ক ১' (Manchester Mark I) নামে একটি প্রোটোটাইপ মেশিন তৈরি করেন। এটি প্রথম মেশিন যাকে সবাই কম্পিউটার হিসেবে বিবেচনা করেন। কারণ এই কম্পিউটারটিতে প্রথমবারের মতো প্রকৃত সংরক্ষিত প্রোগ্রাম ধারণের ক্ষমতা ছিলো।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৪৮

প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে টেপ রেকর্ডার (Tape Recorder) সাধারণের কাজে বিক্রয়ের কাজ শুরু হয়।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৪৯

ম্যানচেস্টার ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির জে. ডব্লিউ. ফরেস্টার (Jay W. Forrester) এবং তাঁর সহযোগীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর অফিসের ব্যবহারের জন্য 'হুইরলউইন্ড' (Whirlwind) নামে একটি যন্ত্র তৈরি করেন। এটি

রিয়েল টাইম কাজ করার জন্য তৈরি বিশ্বের সর্বপ্রথম কম্পিউটার। এটি প্রতি সেকেন্ডে ৫,০০,০০০ যোগ এবং ৫০,০০০ গুণ করতে পারত। বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হতো।

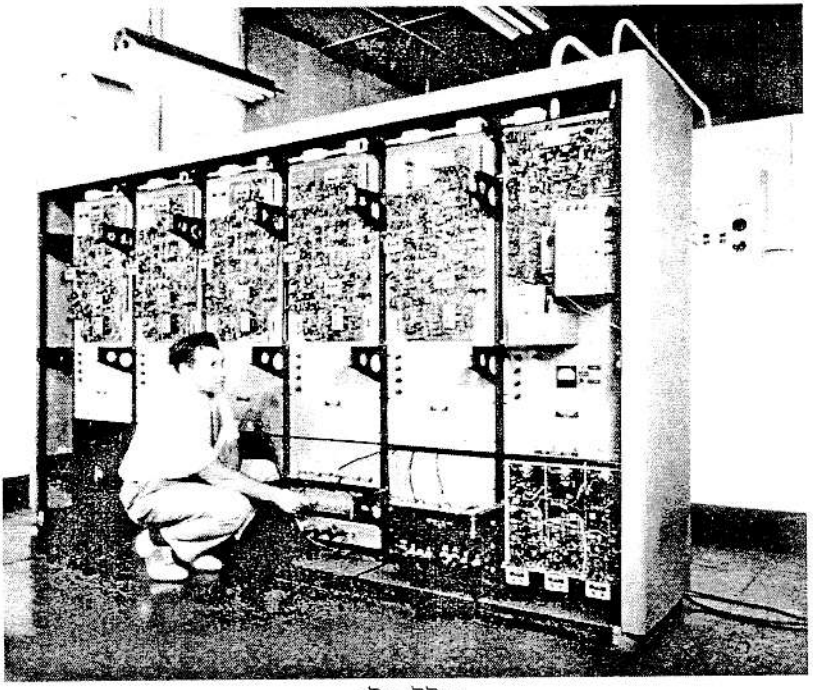

হুইরলউইন্ড

খ্রিস্টাব্দ ১৯৫০

অ্যালান টুরিং (Alan Turing) তাঁর বিখ্যাত Computing Machinery and Intelligence শীর্ষক প্রবন্ধে কম্পিটারের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের বিষয়টি জনসমক্ষে তুলে ধরেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৫১

আদমশুমারি করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনসাস ব্যুরো এককার্ট এবং মউসলে নির্মিত প্রথম ইউনিভ্যাক কম্পিউটার গ্রহণ করে।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৫১

রেমিংটন র‍্যান্ড (Remington Rand) নামক প্রতিষ্ঠানের গ্রেস মুরে হোপার (Grace Murray Hopper) কম্পাইলারের আধুনিক ধারণা প্রদান করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৫২

এডভ্যাক (EDVAC) নামক কম্পিউটারটি শেষ পর্যন্ত তৈরি হয়। এতে ৪০০০টি টিউব, ১০,০০০টি ক্রিস্টাল ডায়োড এবং ১০২৪টি আল্ট্রাসোনিক মেমোরির ৪৪-বিট শব্দ ছিল। এর ক্লক স্পিড ছিল ১ মেগাহার্টজ।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৫৫

ট্রানজিস্টর আবিষ্কার করার জন্য এই বছর জন বার্ডেন (John Bardeen), ওয়াল্টার ব্রাটেইন (Walter Brattain) এবং উইলিয়াম শকলি (William Shockley) পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৫৭

সোভিয়েট ইউনিয়ন পৃথিবীর প্রথম ভূ-উপগ্রহ স্পুটনিক (Sputnik) মহাকাশে প্রেরণ করে।

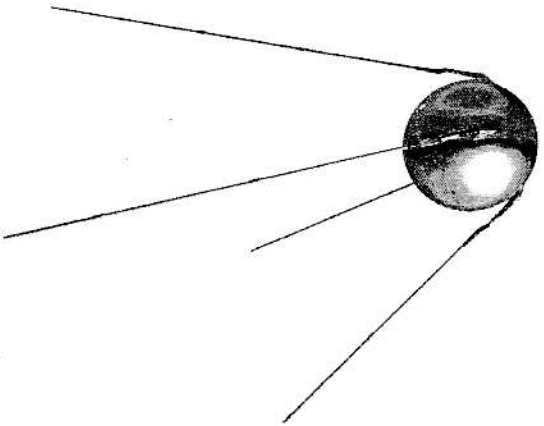

স্পুটনিক

খ্রিস্টাব্দ ১৯৫৮

ম্যাককার্থি প্রথম স্ট্রিং প্রসেসিং ল্যাঙ্গুয়েজ লিসপ (LISP) তৈরি করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৫৯

লিসপ সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং একই সময় কোবল (COBOL) নামক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি হয়।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৬০

প্যাসকেলসহ অসংখ্য প্রোগ্রামিং ভাষার প্রাগপুরুষ হিসেবে অ্যালগল ৬০ (Algol 60) অবমুক্ত করা হয়।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৬২

প্রথমবারের মতো শিল্প-কারখানায় ব্যবহারের উপযোগী রোবট তৈরি করা হয়।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৬৩-৬৪

ডউগ এঙ্গেলবার্ট (Doug Englebart) কম্পিউটার মাউস (computer mouse) আবিষ্কার করেন। একে প্রাথমিকভাবে এক্স-ওয়াই পজিশন ইন্ডিকেটর (X-Y Position Indicator) নাম দেওয়া হয়েছিল।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৬৪

ডার্টমুথ কলেজের (Dartmouth College) জন কেমেনি (John Kemeny) ও থমাস কার্টজ (Thomas Kurtz) প্রথমবারের মতো বেসিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ (BASIC programming language) তৈরি করেন।

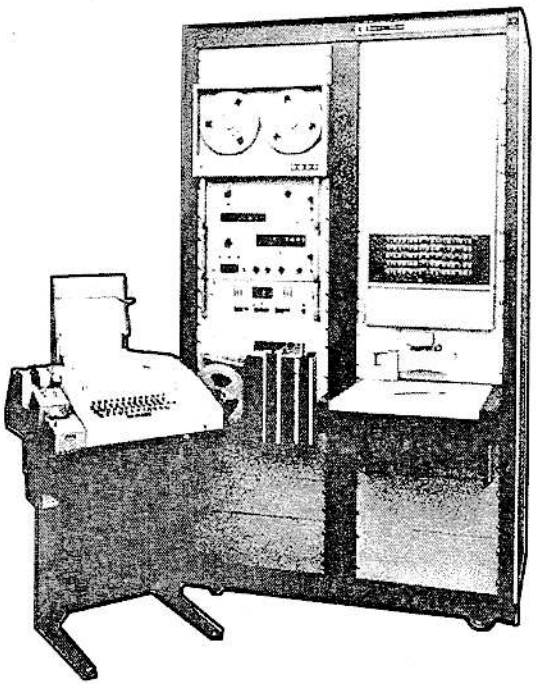

HP2116A রিয়েল-টাইম কম্পিউটার

খ্রিস্টাব্দ ১৯৬৬

হিউলে-প্যাকার্ড (Hewlett-Packard) HP2116A নামের রিয়েল-টাইম কম্পিউটার নিয়ে কম্পিউটার বাজারে প্রবেশ করে। এর মেমোরি ছিলো মাত্র ৮ কিলোবাইট।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৬৬

ইন্টেল প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানিটি ২০০০ বিট মেমোরিসহ সেমিকন্ডাকটর চিপ বাজারে নিয়ে আসেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৬০-এর শেষার্ধে

আইবিএম ৩৬০ পরিবারের প্রসেসরের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা ৩০,০০০-এরও বেশি মেইনফ্রেম কম্পিউটার বিক্রি করে।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৬৭

আইবিএম প্রথমবারের মতো ফ্লপি ডিস্ক তৈরি করে।

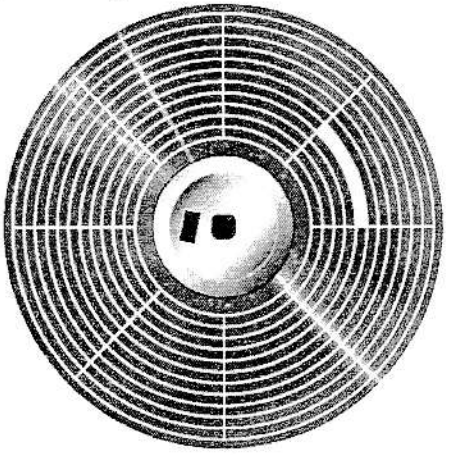

ফ্লপি ডিস্ক

খ্রিস্টাব্দ ১৯৬৭

গ্রিনব্লাটের তৈরি ম্যাকহ্যাক (MacHack) নামের কম্পিউটারটি হুবার্ট ড্রেইফাসকে (Hubert Dreyfus) দাবা খেলায় হারিয়ে দেয়।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৬৯

বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক স্ট্যানলি কুবরিক (Stanley Kubrick) পরিচালিত '২০০১ : এ স্পেস ওডেসি' (2001 : A Space Odyssey) আমজনতার কাছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়টিকে পরিচিত করিয়ে দেয়।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৬৯

ইন্টেল ১ কিলোবাইট র‍্যাম চিপ তৈরির ঘোষণা দেয়, যা আগের যেকোনো র‍্যাম চিপের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৬৯

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এটিএন্ডটি বেল ল্যাবরেটরিতে (AT&T Bell Laboratories) কেন থম্পসন (Ken Thompson) ও ডেনিস রিটচি (Dennis Ritchie) নামের দুজন বিজ্ঞানী ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম (Unix operating system) তৈরি করেন। এই অপারেটিং সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে মাল্টিটাস্কিং, ভার্চুয়াল মেমোরি, মাল্টিইউজার ডিজাইন এবং নিরাপত্তা। অল্পদিনেই এটি একটি জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

UNIX®

খ্রিস্টাব্দ ১৯৬৯

আর্পানেট (ARPANET) নামক প্রযুক্তির মাধ্যমে ইউসিএলএ (UCLA) ও স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট (Stanford Research Institute)-এর দুটি কম্পিউটারের মধ্যে প্রথমবারের মতো যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের ইন্টারনেট প্রযুক্তির সূচনা করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭০

ডগলাস এনগেলবার্ট (Douglous Engelbart) মাউসের পেটেন্ট করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭১

স্টিফেন ওজনিয়াক (Stephen Wozniak) এবং বিল ফার্নান্ডেজ (Bill Fernandez) যৌথভাবে 'ক্রিম সোডা কম্পিউটার' (Cream Soda computer) নামে একটি কম্পিউটার তৈরি করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭১

ইন্টেল প্রথমবারের মতো প্রতি সেকেন্ডে ৬০০০০ যোগ করতে সক্ষম মাইক্রোপ্রসেসর বাজারজাত করে।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭২

রে টমলিনসন (Ray Tomlinson) ই-মেইল ঠিকানায় ব্যবহার করার জন্য @ চিহ্নটি নির্বাচন করেন। তিনি ই-মেইল করার জন্য ব্যবহৃত প্রথম সফটওয়্যারটিও তৈরি করেছিলেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭২

ডেনিশ রিচি (Dennis Ritchie) C আবিষ্কার করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭২

বিল গেটস (Bill Gates) ও পল অ্যালেন (Paul Allen) যৌথভাবে ট্রাফ-ও-ডাটা (Traf-O-Data) নামক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেন, যা পরবর্তীকালে মাইক্রোসফট (Microsoft) নামে পরিচিতি লাভ করে।

Microsoft®

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭২

স্টিফেন ওজনিয়াক (Stephen Wozniak) ও স্টিভেন জব (Steven Jobs) ব্লু বক্স (blue boxes) বিক্রির কাজ শুরু করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭২

ইলেকট্রনিক মেইল শুরু হয়।

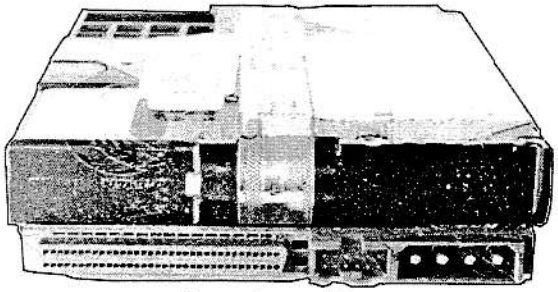

উইনচেস্টার হার্ড ডিস্ক

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭৩

আইবিএম প্রথমবারের মতো আবরণযুক্ত হার্ডডিস্ক তৈরি করে। এর নাম ছিল 'উইনচেস্টার' (Winchester)। এতে দুটি ৩০ মেগাবাইট প্লেটার (platters) ছিল।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭৫

এমআইটিএস (MITS) নামক প্রতিষ্ঠানটি প্রথম পার্সোনাল কম্পিউটার তৈরি করেন। ইন্টেলের তৈরি ৮ বিটের ৮০৮০ প্রসেসর যুক্ত এই কম্পিউটারটির নাম ছিল অ্যালটেয়ার ৮০৮০ (Altair 8080)। এতে ২৫৬ বাইট মেমোরি যুক্ত ছিল। অবশ্য এই মেমোরি ১২ কিলোবাইট পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেত।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭৫

অ্যাপল ইনকর্পোরেটেড তাদের প্রথম কম্পিউটার অ্যাপল ১ সর্বসমক্ষে নিয়ে আসেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭৬

প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রানি এলিজাবেথ ইমেইল প্রেরণ করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭৬

স্যুগার্ট (Shugart) ৫.২৫ ইঞ্চি মাপের ফ্লপি ডিস্ক প্রচলন করেন।

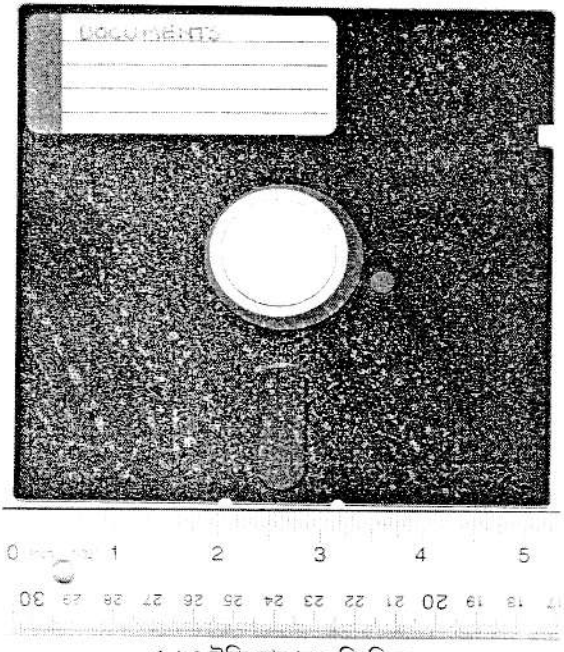

৫.২৫ ইঞ্চি মাপের ফ্লপি ডিস্ক

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭৬

আইবিএম প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সিস্টেম (information processing system) তৈরি করেন। এতে ডিস্কেট স্টোরেজ (diskette storage), চৌম্বকীয় কার্ড রিডার (magnetic card reader)ও রেকর্ডার (magnetic card recorder) এবং একটি ক্যাথোড রে টিউব (Cathode Ray Tube) যুক্ত ছিল। এর প্রিন্ট অংশে ছিল একটি ইঙ্ক জেট প্রিন্টার, স্বয়ংক্রিয় কাগজ এবং খাম প্রবেশ করানোর পদ্ধতিও এর সাথে যুক্ত ছিল।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭৬

অ্যাপল কম্পিউটার তাদের অফিস খোলেন কুপারটিনোতে (Cupertino)। একই সাথে তারা অ্যাপল II কম্পিউটারটিও বাজারে নিয়ে আসেন। এটি রঙিন

গ্রাফিক্সযুক্ত বিশ্বের প্রথম পার্সোনাল কম্পিউটার। এতে ৬৫০২ সিপিইউ, ৪ কিলোবাইট র‍্যাম, ১৬ কিলোবাইট রিড অনলি মেমোরি, কি বোর্ড, ৮টি স্লটের মাদারবোর্ড, গেম প্যাডেল এবং বেসিক প্রোগ্রামটি বিল্ট-ইন ছিল।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭৬

কমোডোর (Commodore) প্রথমবারের মতো পিইটি কম্পিউটার (PET computer) তৈরি করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭৬

ট্যান্ডি/রেডিও শ্যাক (Tandy/Radio Shack) তাদের প্রথম টিআরএস-৮০ মাইক্রোকম্পিউটার তৈরির ঘোষণা দেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭৬

আইবিএম ইঙ্ক-জেট প্রিন্টিং পদ্ধতি আবিষ্কারের ঘোষণা দেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭৬

জেভিসি ভিডিওরেকর্ডারে ভিএইচএস ফরমেট (VHS) ব্যবহার শুরু করে।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭৭

টোকিও অডিও মেলায় মিৎসুবিশি, সনি এবং হিটাচি প্রথমবারের মতো অডিও ডিস্ক প্রোটোটাইপ প্রদর্শন করে।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭৮

অ্যাপল ইনকর্পোরেটেড প্রথমবারের মতো Apple II কম্পিউটারে ডিস্ক ড্রাইভ ব্যবহার করতে শুরু করে। একই সাথে তারা লিসা রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (LISA research and development project) শুরু করে।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭৮

জেরক্স ৮০১০ স্টার এবং ৮২০ কম্পিউটার তৈরি করে।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭৮

আইবিএম তাদের তৈরি প্রথম পার্সোনাল কম্পিউটার তৈরি করে।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭৮

এইচপি ৩২-বিট সুপারচিপসহ এইচপি ৯০০০ টেকনিক্যাল কম্পিউটার বাজারজাত করে। একে তারা 'ডেস্কটপ মেইনফ্রেম' (desktop mainframe) হিসেবে বিবেচনা করে।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭৯

কেভিন ম্যাকেঞ্জি কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্য :-) ইমোশনটির প্রচলন করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৭৯

ইউজনেট নিউজ গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৮০

টেলনেট প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে রিমোট লগ-ইন এবং লং ডিসটেন্ট কাজ তথা টেলিকমিউনিকেশনের কাজ সম্ভব হয়।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৮০

অসবোর্ন প্রথম বহনকারী কম্পিউটার তৈরি করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৮০

মাইক্রোসফট প্রথমবারের মতো অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে এমএস-ডস (MS-DOS) প্রচলন করে।

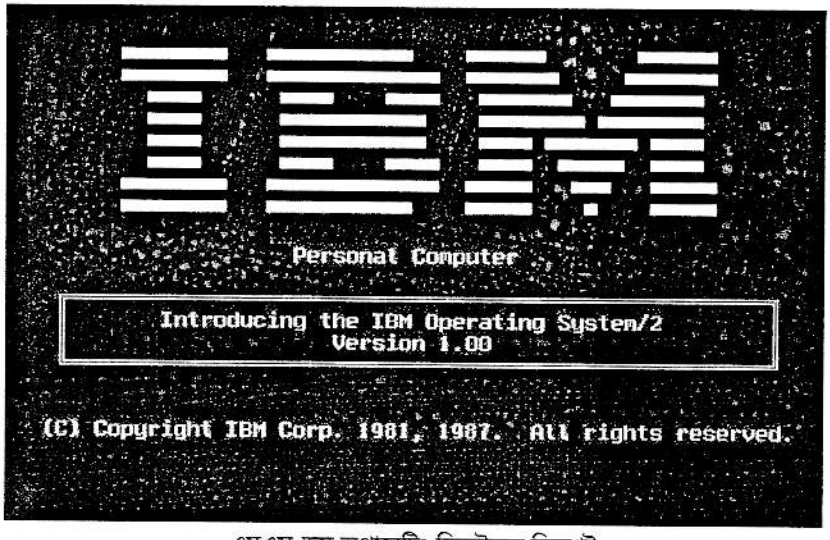

এমএস-ডস অপারেটিং সিস্টেমের স্ক্রিনশট

খ্রিস্টাব্দ ১৯৮২

সনি এবং ফিলিপস সিডি ডিস্ক (১২ সেন্টিমিটার এবং ৭৪ মিনিট পর্যন্ত ভিডিও ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন) উদ্ভাবন করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৮৩

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিডি-টেকনোলজির প্রচলন হয়।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৮৩

অ্যাপল কম্পিউটার ইনকর্পোরেটেড লিসা বাজারজাত করে। এটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করার উপযোগী কম্পিউটার যাতে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস ব্যবহার করা হয়। এই কম্পিউটারে ৫ মেগাহার্টজ ৬৮০০০ সিপিইউ, ৮ কেবি ৫.২৫ ইঞ্চি ফ্লপি ডিস্ক, ১২ ইঞ্চি সাদা–কালো মনিটর, একটি কী বোর্ড এবং একটি মাউস যুক্ত ছিলো।

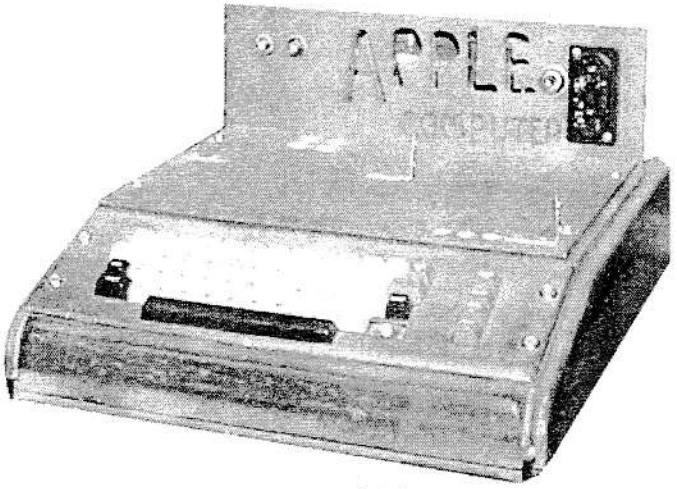

অ্যাপল ১ কম্পিউটার

খ্রিস্টাব্দ ১৯৮৪

অ্যাপল কম্পিউটার ইনক (Apple Computer Inc.) প্রথমবারের মতো ম্যাকিনটোস পার্সোনাল কম্পিউটার (Macintosh Personal Computer) বাজারজাত করে। এটি প্রথম কম্পিউটার যাতে ১২৮ কিলোবাইট মেমোরি এবং ৩.৫ ইঞ্চি ৪০০ কিলোবাইট ধারণ ক্ষমতার ফ্লপি ডিস্ক সংযুক্ত করা হয়েছিলো। এই কম্পিউটারে সংযুক্ত অপারেটিং সিস্টেমের সাথে ম্যাকরাইট নামে একটি ওয়ার্ডপ্রসেসর এবং ম্যাকপেইন্ট নামে ছবি আঁকার একটি সফটওয়্যার সংযুক্ত ছিলো।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৮৪

ডোমেইন নাম সিস্টেম (domain name system) প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৮৪

অ্যাপল কম্পিউটার প্রথমবারের মতো ৩.৫ ইঞ্চি ফ্লপি ডিস্ক বাজারজাত করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৮৫

ফিলিপস এবং সনি প্রথমবারের মতো সিডি-রম টেকনোলজি উদ্ভাবন করার ঘোষণা দেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৮৫

ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল-এর প্রচলন হয়।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৮৭

মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ১.০১ বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করতে শুরু করে।

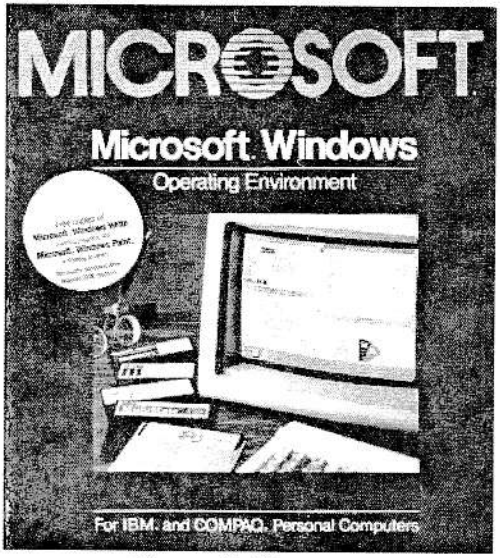

মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ১.০

খ্রিস্টাব্দ ১৯৮৮

বাজারে ৩৮৬ চিপযুক্ত পিসি বিক্রি হতে থাকে। এটি খুব দ্রুত লিসপ মেশিনের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করে।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৮৯

সার্ন-এ (CERN) কাজ করার সময় টিম বার্নারস-লি (Tim Berners-Lee) WWW আবিষ্কার করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৯০

ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পিটার ডুয়েটস (Peter Deutsch) আর্চি এফটিপি সেমিক্রলার সার্চ ইঞ্জিন তৈরি করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৯১

প্রথমবারের মতো সিডিতে তথ্য সংগ্রহ করে রাখার জন্য সিডি-রেকর্ডেবল টেকনোলজি প্রকাশ করা হয়।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৯২

সারা বিশ্বে সর্বমোট ২০টি ওয়েব সার্ভারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যাদের প্রতিটিই কার্যকর ছিলো।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৯৩

আকাশে ২০০টিরও বেশি ওয়েব সার্ভারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যাদের প্রায় প্রতিটিই কার্যকর ছিলো।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৯৪

ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্টেন ভিউ-এর মার্ক অ্যান্ডারসন (Marc Andreessen) নেটস্কেপ WWW ব্রাউজার তৈরি করেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৯৫

সান মাইক্রোসিস্টেমস জাভা প্রোগ্রামিং ভাষা তৈরি করে, যা পরবর্তীকালে সারা বিশ্বের ইলেকট্রনিক জগতে ব্যাপক সাড়া ফেলে।।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৯৫

বিশ্বের প্রথম অনলাইন বুকস্টোর অ্যামাজন.কম প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৯৬

প্রায় ১,০০,০০০ ওয়েব সার্ভার চালু রয়েছে বলে জানা যায়।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৯৭

সারা বিশ্বের ওয়েব ব্রাউজারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬,৫০,০০০-এ।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৯৭

বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন গ্যারি কাসপারভ (Garry Kasparov)-কে এই শ্বাসরুদ্ধকর দাবা প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেয় ডিপ ব্লু ২ (Deep Blue 2) নামের এক সুপার কম্পিউটার।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৯৭

ডিভিডি টেকনোলজি সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য বাজারে ছাড়া হয়।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৯৭

ওয়েব টিভির প্রচলন করা হয়।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৯৮

ইউনিভার্সিটি অব রিডিং-এর সাইবারনেটিক্স-এর প্রফেসর কেভিন ওয়ারউইক (Kevin Warwick) বিশ্বের সর্বপ্রথম মানুষ হিসেবে নিজ দেহে মাইক্রোচিপ সংযোজন করেন। এই মাইক্রোচিপটি তাঁর বাম হাতে ৯ দিন পর্যন্ত লাগানো ছিলো।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৯৯

সারা বিশ্বে ওয়েব সার্ভারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪ কোটি ৩০ লক্ষে পৌঁছায়।

নিউ ইয়র্কের শিল্পী ম্যাকইয়েজ উইজনিয়েভস্কি (Maciej Wisniewski) নেটোম্যাট (Netomat) নামে একটি নন-লিনিয়ার ব্রাউজার প্রকাশ করেন। ওপেন সোর্সভিত্তিক এই ব্রাউজারে তিনি জাভা এবং এক্সএমএল প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। এর ফলে লেখা, ছবি এবং শব্দভিত্তিক তথ্য ওয়েবে আদান-প্রদানের কাজ সহজতর হয়ে উঠে।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৯৯/২০০০

এই বছর ২৫ ঘণ্টা ধরে বিরতিহীনভাবে একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম 2000Today। নতুন বছরকে আহ্বান জানানোর জন্য আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি প্রায় ৬৮টি দেশে সম্প্রচার করা হয়। এতো দীর্ঘসময় ধরে এতগুলো দেশে সম্প্রচারিত টেলিভিশন অনুষ্ঠান বিশ্বে এটাই প্রথম। এই অনুষ্ঠানে ঘড়ির কাঁটা ধরে প্রায় ৬,০০০ প্রযুক্তিবিদ কাজ করে গেছেন। শুধু তা-ই নয়, এই কাজে ৬০টি যোগাযোগ স্যাটেলাইট ব্যবহার করা হয়েছিলো। এই অনুষ্ঠান প্রায় ১০ কোটি লোক সরাসরি অবলোকন করেছেন।

খ্রিস্টাব্দ ১৯৯৯/২০০০

নুপিডিয়ার (Nupedia) শাখা হিসেবে উইকিপিডিয়ার (Wikipedia) যাত্রা শুরু হয়। এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন জিমি ওয়ালস (Jimmy Wales) এবং ল্যারি স্যানগার (Larry Sanger)।

আসকি সংখ্যা

ইংরেজি ASCII বর্ণগুচ্ছের পুরো হলো American Standard Code for Information Interchange. কম্পিউটারে ব্যবহার করার জন্য এই সংকেতগুচ্ছ তৈরি করা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসোসিয়েসন-এর অধীনস্থ একটি কমিটি এই কোড নির্ধারণ করেন। এই কমিটির নাম দেওয়া হয়েছিলো এক্সথ্রি কমিটি (X3 committee)।

পরবর্তীকালে এই কমিটিতে আবারও একটি সাব কমিটি করা হয়, যার নাম দেওয়া হয় এক্সথ্রি.২ (X3.2)। আরো পরে এই কমিটির নাম দেওয়া হয় এক্সথ্রিএলটু (X3L2) সাবকমিটি। এই সাবকমিটিকে আবার বেশ কয়েকটি কার্যকর দলে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে এক্সথ্রি.২.৪ কার্যকর গ্রুপটির (X3.2.4 working group) মাধ্যমে এই কোডটি উপস্থাপিত হয়।

আমরা জানি, কম্পিউটার কোনো শব্দ বা বর্ণ বুঝতে পারে না। কেবল ০ এবং ১ বুঝতে পারে। তাই কোনো বর্ণ বা শব্দ বা চিত্র বা অন্য যে কোনো কিছু বোঝানোর জন্য কম্পিউটারকে ০ এবং ১ দিয়ে বোঝানো হয়। তাই যে সংকেতের মাধ্যমে এসব কম্পিউটারকে বোঝানো হয়, তাকেই আসকি কোড বলে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা এবং চিত্রসংকেত কম্পিউটারে প্রকাশ করার জন্য এই আসকি কোড ব্যবহার করা হয়। এই কোড প্রকৃতঅর্থেই সারা বিশ্বের কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের কাছে আদর্শস্থানীয় হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। একইসাথে এসব কোডের ব্যবহারযোগ্যতাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অনেকদিন আগেই আসকি কোড তৈরি করার কাজ সম্পন্ন করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই কোড ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে এই কোড মূলত নন-প্রিন্টিং সংকেত (Non-Printing Symbol) বা বর্ণ (letter) প্রকাশ করার জন্যই করা হয়। একসময় সারা বিশ্বেই কম্পিউটারের ব্যবহার করার জন্য এই আসকি কোডভিত্তিক বর্ণ তৈরি করা হতো।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে এসব কোডভিত্তিক বর্ণের প্রচলন নেই বললেই চলে। ফলে এই বর্ণ তৈরির প্রচেষ্টা খুব কমই দেখা যায়। আধুনিককালে ইউনিকোডভিত্তিক বর্ণমালার প্রচলন হওয়ার মাধ্যমে এই কোডে লেখার প্রচেষ্টা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে বলেই ধারণা করা হয়। এখানে ইংরেজি বর্ণমালার এবং কিছু সংকেতের আসকি কোড দেওয়া হলো-

আসকি কোড সারণি

0	00110000	O	01001111	m	01101101
1	00110001	P	01010000	n	01101110
2	00110010	Q	01010010	o	01101111
3	00110011	R	01010010	P	01110000
4	00110100	S	01010011	q	01110001
5	00110101	T	01010100	r	01110010
6	00110110	U	01010101	s	01110011
7	00110111	V	01010110	t	01110100
8	00111000	W	01010111	u	01110101
9	00111001	X	01011000	v	01110110
A	01000001	Y	01011001	w	01110111
B	01000010	Z	01011010	x	01111000
C	01000011	a	01100001	y	01111001
D	01000100	b	01100010	z	01111010
E	01000101	c	01100011	.	00101110
F	01000110	d	01100100	,	00100111
G	01000111	e	01100101	:	00111010
H	01001000	f	01100110	;	00111011
I	01001001	g	01100111	?	00111111
J	01001010	h	01101000	!	00100001
K	01001011	i	01101001	‘	00101100
L	01001100	j	01101010	æ	00100010
M	01001101	k	01101011	(	00101000
N	01001110	l	01101100	)	00101001
	space		00100000		

গণিতের জন্ম

গণিতের জন্ম কোথায় হয়েছে?

কিভাবে হয়েছে?

কে করেছে?

কেন করেছে?

এসব প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরেই তাড়িত করেছে মানুষকে। কিন্তু এদের সঠিক উত্তর সন্ধান করা অনেকাংশেই সম্ভব হয়ে উঠেনি। মানুষের অনুসন্ধিৎসা, মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা ও ধী শক্তির মাধ্যমে মানুষ ধীরে ধীরে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে।

হাজার বছর আগের কথা।

মানুষ তখন সবে মাত্র বন্য পরিচয়ের খোলস ছেড়ে বেড়িয়ে এসেছে। সভ্যতার কোনো ছোঁয়াই তার গায়ে তখন লাগেনি। জন্মসূত্রেই এই মানুষ কিন্তু একাকি। একাকি তার বিচরণ, একাকি তার চালচলন, আচার-আচরণ। যা কিছু তখন সে করছে, সবই করছে প্রয়োজনের তাগিদে। শিকার – প্রয়োজনের তাগিদে, খাদ্যগ্রহণ – প্রয়োজনের তাগিদে, বিশ্রাম – প্রয়োজনের তাগিদে, ইত্যাদি।

এরপর মানুষ যুথবদ্ধ হয়ে উঠার চেষ্টা করলো। এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার – এ কাজটিও মানুষ করেছে প্রয়োজনের তাগিদে। প্রয়োজন ছিলো আত্মরক্ষার, প্রয়োজন ছিলো খাদ্যের, প্রয়োজন ছিলো নিরাপদ আশ্রয়ের। এভাবেই মানুষ ক্রমে অন্যের সাথে যুথবদ্ধ হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে এবং সে স্বপ্ন পূরণের চেষ্টা করেছে।

প্রাথমিকভাবে সংখ্যাকে হয়তো আদিমকালের মানুষ 'সংখ্যা' হিসেবে চিন্তা করেনি। তারা এই সংখ্যাকে দেখেছে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে, দেখেছে দলীয় প্রাবল্য হিসেবে। যখন কোনো বড়ো আকারের বন্য পশু শিকার একার পক্ষে সম্ভব হয়নি, তখন চেষ্টা করেছে একের অধিক দল বেঁধে শিকার করতে। আবার জলের সন্ধানে যখন কোনো জলাশয়ে গেছে, যুদ্ধ করতে হয়েছে অন্য দল বা গোত্রের সাথে, এখানেও চেষ্টা হয়েছে দুই দলের মধ্যকার শক্তির পার্থক্য কতটুকু তা জানার। এভাবেই শুরু হয়েছে গণনার, পক্ষান্তরে গণিতের।

মানুষের আদিম অবস্থাতেই গণিতের শুরু। আর গণনা কাজের জন্য মানুষ সর্বপ্রথম তার হাতের আঙুলই ব্যবহার করেছে। তাই তো আমি বলি, মানুষের

আবিষ্কৃত প্রাচীনতম গণক যন্ত্র হলো তার নিজের হাতের আঙুল। তখনও অবশ্য আজকের মতো 'কড়' গুণে সংখ্যা বের করা হতো না। সোজাসুজি আঙুল গুণেই সংখ্যা গণনাা করা হতো। অনেক সময় চোখ দিয়েও সংখ্যা বোঝানো হতো।

এরপর বিভিন্ন ধরনের জিনিস ব্যবহার করে গণনা কাজ করা হয়েছে। আঙুল ছাড়াও একাজে ব্যবহার করা হয়েছে পাথরের নুড়ি, গাছের লতা, গাছের ডাল, ইত্যাদি। সে সময় কোনো ঘড়িও ছিলো না, যা দিয়ে সময় দেখা যায়। ছিলো না কোনো ক্যালেন্ডারও যা দিয়ে দিন গোণা যায়। সূর্য আর চাঁদই ছিলো তাদের একমাত্র সম্বল। এসব নাক্ষত্রিক বস্তু দিয়েই মানুষ সময় গুণেছে, কাল নির্ধারণের চেষ্টা করেছে।

এরপর দীর্ঘসময় ধরে মানুষ ক্রমশ সভ্য হয়েছে। এসময় মানুষ সংখ্যার বিচারে কিছু গণনা না করে, সংখ্যার আধিক্য বোঝানোর জন্য পশুর পাল, মানুষের দল, শস্যের গোলা, ইত্যাদি বলেছে। এসব কথায় সংখ্যার প্রয়োজন ছিলো না।

প্রকৃতি আগেই তৈরি করেছে গ্রামীণ ব্যবস্থা। মানুষ যখন নাগরিক সভ্যতা সৃষ্টি করেছে, তখন থেকে মূলত বিপণন ব্যবস্থাকে সামনে রেখে শুরু হয়েছে গণনা কার্যক্রম। কারণ মানুষ তখন দেখেছে ৪ এবং ৪০–এর মধ্যে পার্থক্য বোঝানোর জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো পথ নেই। দুটোকে বোঝানোর জন্য দুটি পৃথক শব্দ প্রয়োজন।

শুরু হলো প্রচেষ্টা।

কিন্তু তারপরেও কথা থাকে।

কীভাবে এসব সংখ্যা বোঝানো হবে?

কারণ মুখে মুখে বিভিন্ন এলাকার মানুষ বিভিন্ন ভাষায় কথা বললেও সেগুলো লিখে প্রকাশ করার কোনো উপায় তো তখন ছিলো না। এমনকি লেখার জন্য কোনো কাগজ বা পেন্সিলও ছিলো না।

ব্যাবিলনবাসীরা মাটির ট্যাবলেটে ছাপ দিয়ে লিখন পদ্ধতির প্রচলন করে। এসব সংখ্যা লিখনের পদ্ধতি বলতে তো তেমন কিছু নেই, আছে কিছু আঁকিবুঁকি। আর আছে প্রকৃতিতে দেখা বিভিন্ন প্রাণী, উদ্ভিদ আর পশুর দল। অনেকে বিভিন্ন তৈজসপত্রে ছাপ দিয়ে লিখে রাখতো কোনো সংখ্যা বা বিষয় বা পাথরে খোদাই করে রাখতো নানা কিছু।

মজার বিষয় হলো, গণনা করার এসব সংখ্যা বিশেষ কিছু সংকেত বৈ আর কিছু নয়। নিচে মিশরীয়দের ব্যবহৃত কিছু সংকেত দেখানো হলো–

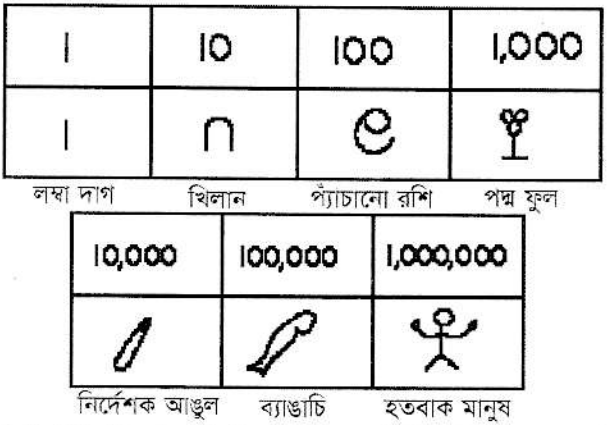

সূত্র: Ortenzi, E. 1964. Numbers in Ancient Times. Maine: J. Weston Walch থেকে।

চীনদেশের মানুষ তখন সংখ্যা গণনার জন্য বিভিন্ন প্রাচীন পদ্ধতি ব্যবহার করছে। এক্ষেত্রে কেবল টেবিলের উপর লাগানো কিছু দণ্ডই বেশি ব্যবহার করে। ধারণা করা হয়, চীনের এই গণনা পদ্ধতি প্রাচীনতম পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। চীনের এই পদ্ধতিটি নিচে দেখানো হলো–

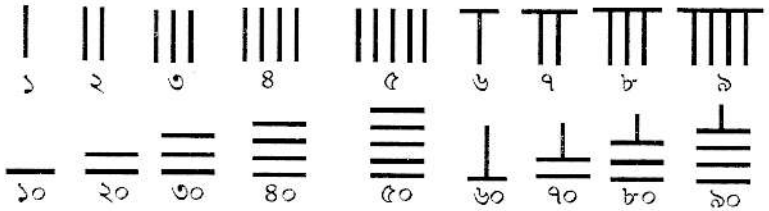

সূত্র: Smith, D. and Ginsburg, J. 1937. Numbers and Numerals. W. D. Reeve থেকে।

খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ সাল থেকে গ্রীকরা সংখ্যা লিখনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করতো। তবে প্রথম ১০টি সংখ্যা লিখার বিষয় সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে। গ্রিকরা চেষ্টা করেছে তাদের ভাষার মাধ্যমে প্রথম ১০টি সংখ্যা লিখার চেষ্টা করেছে। তবে তারা ভাষা থেকে সংখ্যার পার্থক্য বোঝানোর জন্য দুটি চিহ্ন ব্যবহার করতো। চিহ্ন দুটি হলো / এবং '। নিচে এই ধরনের কয়েকটি বর্ণ দেখানো হলো-

A' B' Γ' Δ' E' F' Z' H' Θ'

সূত্র: Smith, D. and Ginsburg, J. 1937. Numbers and Numerals. W. D. Reeve থেকে।

রোমানরা সংখ্যা লিখনের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করতেন, তা বর্তমানকালেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। তবে সময়ের সাপেক্ষে এসব

সংকেতের আকার বা রূপ বা গড়নের বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। নিচে কয়েকটি রোমান সংখ্যা দেখানো হলো–

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

সূত্রঃ Smith, D. and Ginsburg, J. 1937. Numbers and Numerals. W. D. Reeve থেকে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনেকক্ষেত্রে রোমানরা IV সংখ্যা লেখার জন্য IV না লিখে IIII ব্যবহার করা হতো। বর্তমানকালে রোমান সংখ্যা বিভিন্ন প্রকাশনার পৃষ্ঠা সংখ্যা বা অধ্যায় সংখ্যা নির্বারণের জন্য ব্যবহার করা হয়।

প্রাচীনকালে গ্রীকবাসীরা আঙুল সংকেত ব্যবহার করে গণনা কাজ করার চেষ্টা করতেন। পরবর্তীকালে শুধু গ্রিকরাই নয়, রোমান, ইউরোপিয় এবং এশীয়বাসীরা এই সংখ্যা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। গবেষণা, কোনো তথ্য নির্বাচন ও হিসাব–নিকাশের কাজে আঙুল দিয়ে গণনা করার পদ্ধতি চালু হয়। নিচে আঙুল সংকেত দিয়ে সংখ্যা গণনা পদ্ধতি দেখানো হলো–

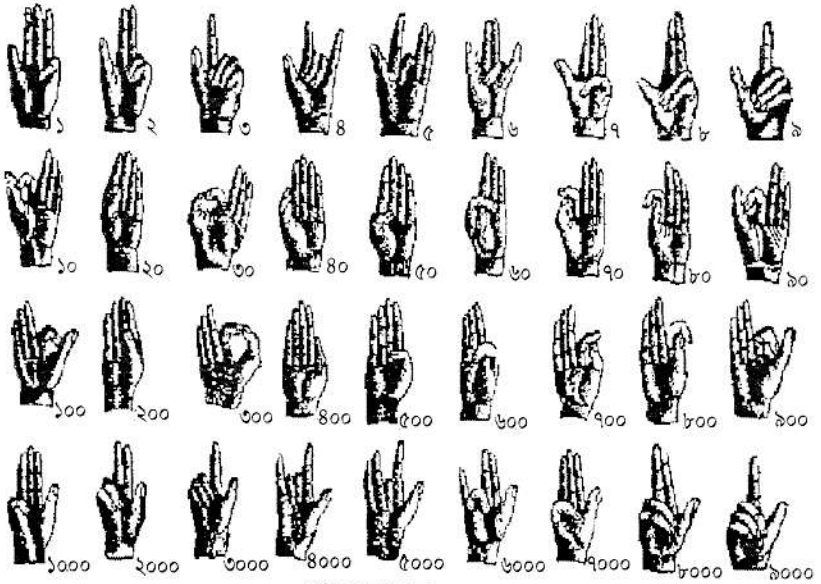

আঙুল সংকেত

(১৫২০ সালে প্রকাশিত একটি ম্যানুয়াল থেকে)

সূত্রঃ Dantzig, T. 1954. Number : The Language of Science. Macmillan Co. থেকে।

এখনও শিশুকালে আঙুল গুণে বা কড় গুণে সংখ্যা গণনা শিখানোর পদ্ধতি চালু রয়েছে অনেকদেশেই।

কিন্তু বর্তমানে আমরা যে সংখ্যাবিন্যাস দেখি, তা মূলত সংস্কৃত ভাষা বা বর্ণ থেকে উদ্ভূত হয়। প্রাচীন ভারতের হিন্দু সংখ্যা গণিত এক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে।

তবে গাণিতিক সংখ্যার বিবর্তনের ধারা খুবই জটিল। এবিষয়ে নানা ধরনের মতামতও পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা করার পরিপ্রেক্ষিতে যতদূর জানা যায়, তাতে বোঝা গেলে মূলত খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০ অব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত গাণিতিক এসব সংখ্যার বিবর্তন ঘটেছে ধীরে ধীরে। এরই মাঝে সংখ্যা চারিত্রিক রূপ পরিবর্তিত হয়েছে নানাভাবে। তবে আমরা এখনও প্রাচীনকালের অনেক সংখ্যাই ব্যবহার করে থাকি। সারণি ১–এ প্রাচীনকাল থেকে ১৫২২ সাল পর্যন্ত গাণিতিক সংখ্যার বিবর্তন দেখানো হলো–

সারণি ১: প্রাচীনকাল থেকে ১৫২২ সাল পর্যন্ত গাণিতিক সংখ্যার বিবর্তন

১-Boethius; ২-Boethius; ৩-Gubar; ৪-Maximus Planudes.; ৫-Caxton; ৬-Wagner; ৭-Tonstall;

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গাণিতিক সংখ্যা চারিত্রিক রূপ পরিবর্তন কি একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে?

আপাতদৃষ্টিতে তা মনে হলেও, বিষয়টি হয়তো তেমন নয়। বিশ্বের স্বাভাবিক নিয়মই হলো পরিবর্তন। অন্যভাবে বলা যায়, পরিবর্তন, পরিবর্তন আর পরিবর্তনই এই বিশ্বকে পরিপূর্ণ ও বৈচিত্রময় করে তুলেছে। রেখেছেও বটে। তাই বর্তমানে গণিত সংখ্যা যেসব রূপ দেখা যায়, সেসব রূপের কোনো পরিবর্তন হবে না এমনটা চিন্তা করা বোধহয় সমীচিন নয়।

তাই অনেক গণিতবিদদের ধারণা সংখ্যার গড়ন প্রতিনিয়ত যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে ২১৪০ সালে এসব সংখ্যার গড়ন কি হবে, তা কেউই আগে থেকে বলতে পারবে না।

অ্যাবাকাস

যিশু খ্রিষ্টের জন্মেরও প্রায় ৩০০০ বছর আগে ব্যাবিলনের মানুষ গণণা করার জন্য র অ্যাবাকাস (abacus) নামের যন্ত্রটি তৈরি করে। অ্যাবাকাস খুবই সরল ধরনের একটি গণক যন্ত্র।

অ্যাবাকাস শব্দের উদ্ভব হয়েছে হিব্রু শব্দ অ্যাবাকা থেকে, যার অর্থ ধূলি বা বালি। এটি কাঠের তৈরি আয়তাকার একটি কাঠামো দিয়ে তৈরি করা হয়। কাঠামোটি আবার একটি আড়দণ্ড দিয়ে আনুভূমিকভাবে দুভাগে বিভক্ত। উপরের অংশটি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং নিচের অংশটি অপেক্ষাকৃত বড়ো। কাঠামোর দুই অংশেই সমদূরত্ব বজায় রেখে উলম্বভাবে কতগুলো দণ্ড লাগানো থাকে। উপরের অংশের উলম্ব দণ্ডে একটি বা দুটি এবং নিচের অংশের উলম্ব দণ্ডে পাঁচটি করে গুটি থাকে।

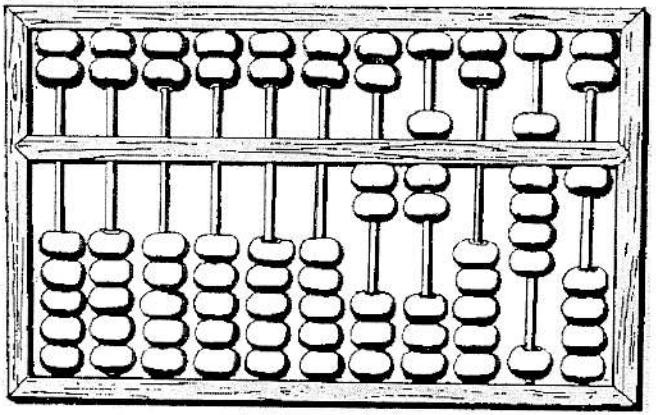

সুয়ান পান বা অ্যাবাকাস

ব্যাবিলনে প্রথম প্রচলন হলেও চীনেই অ্যাবাকাস বেশি ব্যবহৃত হতো। এক পর্যায়ে অ্যাবাকাস বলতে কেবল চীনের অ্যাবাকাসকেই বোঝানো হতো। চীনে অবশ্য অ্যাবাকাসকে বলা হতো সুয়ান পান (suan pan)। পরে তাদের কাছ থেকে গ্রিক ও রোমানরা অ্যাবাকাস ব্যবহার করতে শেখে। অ্যাবাকাস পরবর্তীকালে জাপানে সরোবান (soroban) ও রাশিয়াতে স্ক'টি (s'choty) নামে পরিচিতি লাভ করে।

চীনের সুয়ান পানের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এতে ৭টি গুটি থাকে। অ্যাবাকাসের মাঝখানের আড় দণ্ডের উপরে ২টি ও নিচে ৫টি গুটি থাকে। আড়দণ্ডের উপরের

গুটির মান ৫ ও নিচের গুটির মান ১। মাঝখানের আড়দণ্ডের উপরের দিকের ২টি গুটিকে স্বর্গ বা হ্যাভেন এবং নিচের দিকের ৫টি গুটিকে পৃথিবী বা আর্থ বলে। গণনার সময় এসব গুটিকে মাঝখানের দণ্ডের কাছাকাছি সরিয়ে আনা হয়। এই যন্ত্র দিয়ে খুব সহজেই যোগ এবং বিয়োগ করার কাজ করা যায়।

চীনের প্রাচীন একটি কাঠখোদাই করা চিত্রে সুয়ান পানের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে

অন্যদিকে জাপানী সরোবানের গুটির সংখ্যা দণ্ডের উপরের দিকে ১টি ও নিচের দিকে ৫টি করে।

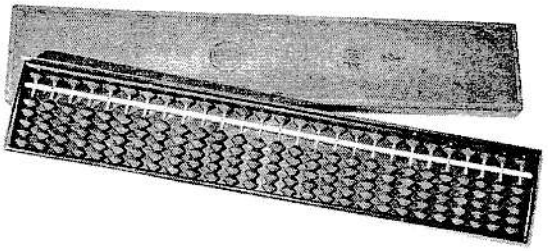

জাপানের সরোবান

রাশিয়ার স্করটিয়ার বিস্ময়করভাবে কোনো আড়দণ্ড থাকে না। ফলে এটি অন্য দুই ধরনের অ্যাবাকাস থেকে বৈশিষ্ট্যগতভাবেই ভিন্ন। এতে গুটির সংখ্যা ১০টি।

অ্যাবাকাসের গুটিসমূহকে ডানদিক থেকে বামদিকে ধারাবাহিকভাবে একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত-এই কয়টি অংশে চিহ্নিত করা হয়।

সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে এসব গুটি চালনা করে গণনা কাজ চালানো হয়। একজন অভিজ্ঞ অ্যাবাকাস ব্যবহারকারী আধুনিক ডিজিটাল ক্যালকুলেটরের (Digital calculator) চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি গণনা কাজ করতে পারেন। একে অনেকেই সেমিমেকানিক্যাল ক্যালকুলেটর (Semimechanical calculator) নামেও অভিহিত করে থাকেন।

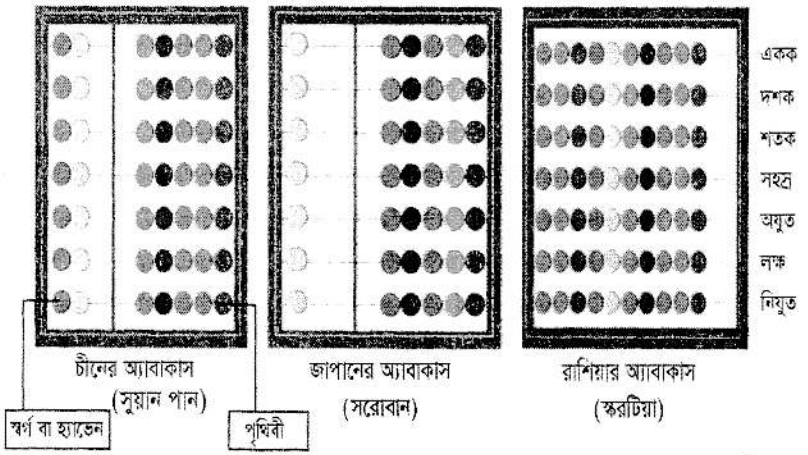

তিন ধরনের অ্যাবাকাস : বামে – সুয়ান পান; মাঝে – সরোবান ও ডানে – স্ক'টি

বর্তমানকালে অ্যাবাকাসের ব্যবহার কোথাও দেখা যায় না। তবে জানা গেছে, চীনের গ্রামাঞ্চলে কোনো কোনো এলাকায় এখনও কিছু কিছু লোক নিজেদের হিসাব-নিকাশ করার জন্য অ্যাবাকাস ব্যবহার করেন। তবে বিশ্বের অন্য কোথাও ব্যাপকভাবে অ্যাবাকাস ব্যবহারের তেমন কোনো নজির নেই। কিছু কিছু লোক সৌখিনভাবে এটি ব্যবহার করে থাকেন।

সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, আজও প্রতি বছর চীন, জাপান ও তাইওয়ানে অ্যাবাকাস ব্যবহারের উপর একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের নানা দেশের সৌখিন অ্যাবাকাস ব্যবহারকারী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

বৈদিক গণিত

বৈদিক গণিত (Vedic Mathematics) এবং সনাতন ধর্মের সংস্কৃতি সম্ভবত এক সূত্রে গাথা। এই দুটি বিষয়কে আলাদা করে চিন্তা করাটা ছিল এক অর্থে ধর্মীয় ভ্রষ্টাচারেরই সামিল। প্রাচীন ভারতে এই গণিতের জয় জয়কার ছিল। শুধু প্রাচীন ভারতেই নয়, এই গণিতের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বময়।

ধারণা করা হয় যে, বৈদিক গণিতের উৎস হচ্ছে বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি। মূলত বিভিন্ন বেদের উপর ভিত্তি করেই বৈদিক গণিতের উদ্ভব ঘটেছে এবং কালক্রমে তা বিকাশ লাভ করেছে। বেদ কবে প্রণীত বা সংকলিত হয়েছে, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। বিভিন্ন গবেষক এর সময়কাল ভিন্ন ভিন্নভাবে চিন্তা করেছেন। তবে একথা স্পষ্ট যে, একটি সুদীর্ঘ সময় ধরেই ধীরে ধীরে বেদসমূহ সংকলিত হয়েছে। তবে বেদ সংকলনের এই সুদীর্ঘ কালের ঠিক কোন্ সময় বা কোন্ প্রেক্ষাপটে বৈদিক গণিতশাস্ত্রের শুরু হয়েছিল, সঠিকভাবে তা আর বলা সম্ভব নয়। বলতে গেলে তা কালের গর্ভে প্রায় হারিয়েই গেছে।

বর্তমানকালে বৈদিক গণিতের পুনর্জাগরণ ঘটেছে এবং এই পুনর্জাগরণের বিষয়টি মোটামুটিভাবে আশ্চর্যের বিষয় হিসেবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। কারণ বৈদিক সাহিত্য থেকে উদ্ভূত বৈদিক গণিত এতোটাই উচ্চাঙ্গের ছিল যে, সেগুলো সঠিকভাবে বোঝার জন্য শুধু সংস্কৃত সাহিত্য জানলেই হয় না, থাকতে হয় উচ্চমাপের গাণিতিক জ্ঞান ও দক্ষতা। কেবল এই মাপের জ্ঞান ও দক্ষতার

মাধ্যমেই সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উপপাদ্য এবং অনুসিদ্ধান্তসমূহ খুঁজে বের করা সম্ভবপর হতে পারে।

এক্ষেত্রে কয়েকজন পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। এঁরা হলেন জগৎগুরু স্বামী ভারতী কৃষ্ণ তীর্থজী মহারাজ, সারদা পীঠের শঙ্করাচার্য, বৌধায়ন, প্রমুখ। এছাড়াও গোবরধাম মঠও বৈদিক গণিত নিয়ে প্রচুর চর্চা করেছিলেন। এসব ধর্মদের সমন্বিত কাজের মাধ্যমেই বৈদিক গণিতের অনেক রহস্য আধুনিক গণিতপ্রিয় মানুষের কাছে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে।

বৈদিক গণিত নিয়ে গবেষণা করে অথর্ববেদে মাত্র ১৬টি বৈদিক গাণিতিক সূত্র এবং ১৩টি বৈদিক গাণিতিক উপসূত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রাচীনকালের ভারতীয় বা হিন্দু গণিতবিদরা প্রতিনিয়ত তপচর্চা ও অলৌকিক ধ্যানের মাধ্যমেই এসব জ্ঞানচর্চার কাজ করে যেতেন।

দীর্ঘদিনের গভীর পর্যালোচনা এবং সাধনার পর ধীরে ধীরে বৈদিক গণিতের গুঢ় রহস্য উন্মোচন করা হচ্ছে, আবিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছে গণিতের বিশাল ও লুকানো এক মহাবিশ্বের। একই সাথে উন্মোচিত হচ্ছে এই গণিতকে তখন কিভাবে ব্যবহার করা হতো।

গবেষকদের মতে, বৈদিক গণিতে যেসব সূত্র রয়েছে, সেগুলো আধুনিক গণিতের প্রায় সবগুলো ক্ষেত্রই কোনো না কোনোভাবে স্পর্শ করেছে। বৈদিক গণিতে এসব সূত্র সুল্বসূত্র (Sulbasutra) হিসেবে পরিচিত।

সূত্র

বৈদিক গণিতের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত ১৬টি সুল্বসূত্র নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. একাধিকেন পূর্বেন
২. নিখিলং নবতশ্চনমংদশতঃ
৩. লম্বতির্যগভ্যাম্
৪. পরাবর্ত্যযোজয়েৎ
৫. শূন্যং সাম্যমুচ্চয়ে
৬. আনুরূপ্যে শূন্যং অন্যত্
৭. সংকলন ব্যবকলনাভ্যাং
৮. পূরণাপূরণাভ্যাং
৯. চলনকলনাভ্যাম্
১০. যাবদূনং
১১. ব্যষ্টিসমষ্টিঃ
১২. শেষাণা চরমেণ

১৩. সোপান্ত্যদয়মন্ত্যং
১৪. একন্যূনেন পূর্বেন
১৫. গুণিতসমুচ্চয়ঃ
১৬. গুণকসমুচ্চয়

উপসূত্র

বৈদিক গণিতের ১৬টি সুল্বসূত্রের সহাযোগী হিসেবে ব্যবহৃত ১৪টি উপসূত্র নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. আনুরূপ্যেণ
২. শিষ্যতেশেষসংজ্যেঃ
৩. আদ্যমাদ্যেনান্ত্যমন্ত্যেন
৪. কেবইলঃসপ্তকংগুণ্যাৎ
৫. বেস্টনম্
৬. যাবদূনং তাবদূনং
৭. যাবদুনং তারদুনীকৃত্য বর্গং চ যোজয়েৎ
৮. অন্ত্যয়োর্দশকেইপি
৯. অন্ত্যয়োরের
১০. সমুচ্যয়গুণিতং
১১. লোপস্থাপনাভ্যাং
১২. বিলোকনং
১৩. সমুচ্চয়গুণিতঃ
১৪. ধ্বজাঙ্

কম্পিউটার বিশ্বে প্রথম

কম্পিউটার আধুনিক বিশ্বের অন্যতম জরুরি এবং বহুল ব্যবহৃত একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র। জীবনের এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে কম্পিউটার ব্যবহার করা হচ্ছে না। কম্পিউটার বা কম্পিউটারের সাহায্যে যেসব কাজ করা হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু একদিনে বা একবারেই আসেনি। দীর্ঘদিনের অমানুষিক পরিশ্রমের মাধ্যমেই এসব কাজ করা সম্ভব হয়েছে। এখানে কম্পিউটার বিশ্বের কিছু পণ্য বা প্রযুক্তির প্রথমদিকের বিস্ময়কর ঘটনা জানানো হলো–

১. কোবল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ (COBOL Programming Language) নামে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষা রয়েছে। এর পুরো নাম কমন বিজনেস ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ (COmmon Business Oriented Language)। এই ভাষাটির জন্ম ১৯৫৯ হয় সালের প্রথমদিকে। এই প্রোগ্রামিং ভাষাটি মূলত ব্যবসা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির কাজ সহজীকরণের লক্ষ্যে তৈরি করা হয়। তবে এই প্রোগ্রামিং ভাষাটি তৈরি করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আগ্রহ আর উদ্যেগই সবচেয়ে বেশি ছিলো।

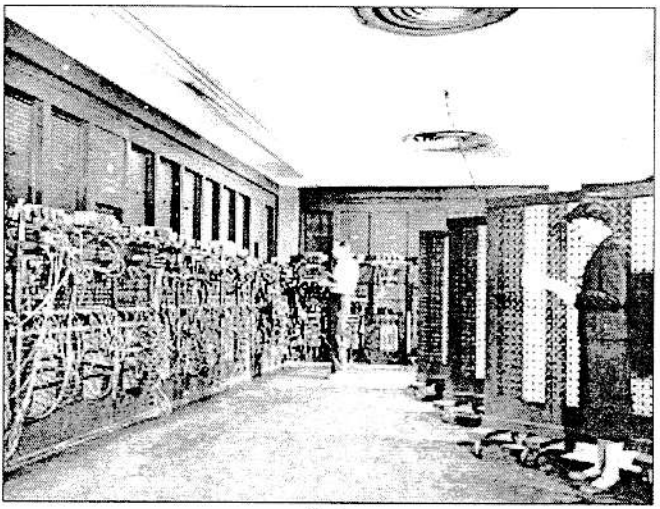

এনিয়াক

২. কম্পিউটার বিশ্বের সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক ডিজিটাল কম্পিউটারের নাম এনিয়াক (ENIAC)। এর পুরো নাম হলো ইলেকট্রনিক নিউমেরেটর

ইন্ট্রিগেটর অ্যানালাইজার এন্ড কম্পিউটার (Electronic Numerator Integrator Analyser and Computer)। ইনিয়াকের নির্মাতা ও ডিজাইনার ছিলেন পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন মউচলি (John Mauchly) এবং জে. প্রেসপার একার্ট (J. Presper Eckert)। এটি তৈরি করা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর ব্যালিস্টিক রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে গবেষণাকাজে ব্যবহার করার জন্য।

৩. বিশ্বের সর্বপ্রথম ইমেইল প্রেরণ করেন রেমন্ড টমলিনসন। তিনিই ইমেইল অ্যাড্রেসে @ সংকেতটি ব্যবহার করেন।

৪. আইবিএম বা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিনস ১৯৭৩ সালের দিকে সর্বপ্রথম রিড/রাইট ফ্লপি ডিস্ক (Read/Write Floppy Disk) বাজারজাত করে। নতুন এই সিস্টেমটি একটি ডিস্কে প্রায় ২৫০ কিলোবাইট তথ্য ধারণ করতে পারতো।

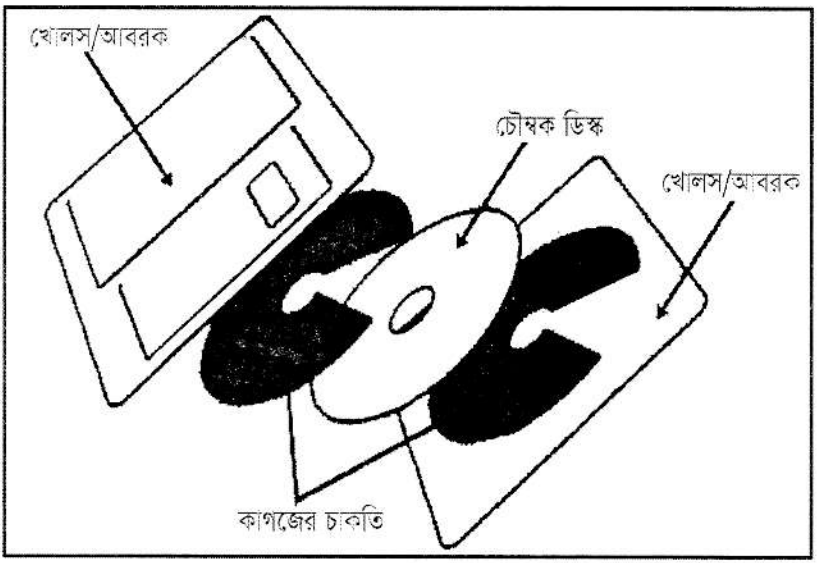

রিড/রাইট ফ্লপি ডিস্ক ও তার অভ্যন্তর অংশ

৫. বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্ক্রিপটিং ভাষার নাম জাভাস্ক্রিপ্ট। এটি যখন প্রথম বাজারজাত করা হয়, তখন এর নাম ছিল মোচা। পরবর্তীকালে এর নাম রাখা হয় লাইভস্ক্রিপ্ট এবং সবশেষে জাভাস্ক্রিপ্ট। এটি মূলত ক্লায়েন্ট সাইড ওয়েব ডেভেলপমেন্ট-এর জন্যই ব্যবহার করা হয়।

নেটস্কেপ কমিউনিকেশন্সের প্রকৌশলী ব্রেনডন আইচ এই স্ক্রিপ্ট প্রণয়ন করেন।

৬. কোনো হাতঘড়ির ঘণ্টার কাঁটার দৈর্ঘ্য ২ সেন্টিমিটার হয়, তবে সেটির গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ০.০০০০০২৭৫ মাইল।

৭. বর্তমানে ইংরেজিতে কোনো কিছু কম্পিউটারে লেখার জন্য সবচেয়ে বেশি যে ফন্টটি ব্যবহার করা হয়, তার নাম টাইমস নিউ রোমান (Times New Roman)। এই ফন্টটির ডিজাইন করেছিলেন স্ট্যানলি মরিসন। বাজারে টাইমস ওল্ড রোমান নামে অন্য একটি ফন্ট থাকার কারণে এই ফন্টের নাম দেওয়া হয় টাইমস নিউ রোমান। এখানে এই ফন্টটির কিছু বর্ণ নমুনা হিসেবে দেওয়া হলো–

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

১৯৩১ সালের দিকে খ্যাতনামা ব্রিটিশ পত্রিকা 'দি টাইমস' এই ফন্টটি তৈরি করার ডিজাইনারকে রীতিমত অর্ডার দিয়েছিলেন।

৮. বর্তমানে ইন্টারনেটের জগতে নানা ধরনের সার্চ ইঞ্জিন (search engine) রয়েছে। এসব সার্চ ইঞ্জিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ওয়েবসাইট থেকে নানা ধরনের তথ্য এনে হাজির করে প্রার্থিত ব্যক্তির কাছে। এই ধরনের সার্চ ইঞ্জিনের সর্বপ্রাচীন বা সবচেয়ে পুরনো সার্চ ইঞ্জিন হলো আর্চি (Archie)। কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অ্যালান এমটেগ (Alan Emtage) ১৯৯০ সালে এই সার্চ ইঞ্জিনটি তৈরি করেন।

৯. বিশ্বখ্যাত সার্চ ইঞ্জিন আল্টাভিস্তা যখন প্রথম সার্বজনীন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অবমুক্ত করা হয়, তখন এর নাম ছিল 'ভিস্তা' (Vista)। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেকে একে ভুলক্রমে 'আল্টাভিস্তা' (Altavista) নামে অভিহিত করতে থাকলে এর উদ্যোক্তারা এর নাম 'আল্টাভিস্তা'–ই রেখে দেন।

১০. বিশ্বের অনেক প্রতিষ্ঠানই কম্পিউটার সিস্টেম তৈরি করে বাজারজাত করে আসছে। কিন্তু কম্পিউটার সিস্টেম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ডেল সর্বপ্রথম ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বাজারজাত করতে শুরু করে।

১১. বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ও সর্বাধিক ব্যবহৃত সোশাল নেটওয়ার্কিং ওয়েবসাইট ফেসবুকের (Facebook) প্রতিষ্ঠাতার নাম মার্ক জুকারবার্গ (Mark Zuckerberg)। ১৯৮৪ সালের ১৫ই মে জন্মগ্রহণকারী জুকারবার্গ ফেসবুকের (Face Book) প্রধান নির্বাহীও বটে।

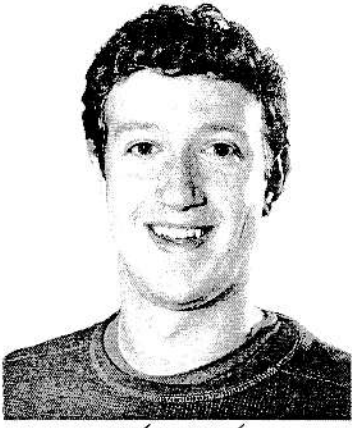

মার্ক জুকারবার্গ

১২. কোনো দেশের কোনো নির্বাচনে প্রথমবারের মতো যে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়, তার নাম ইউনিভ্যাক (UNIVAC)। এর প্রকৃত নাম ইউনিভার্সাল অটোমেটিক সিকোয়েন্স কম্পিউটার (Universal Atomatic Sequence Computer)। ১৯৫১ সালে রেমিংটন র‍্যান্ড (Ramington Rand) নামক প্রতিষ্ঠানের তৈরি এই কম্পিউটার ব্যবহার করে ১৯৫২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিলো যে, আইজেনহাওয়ার সেই নির্বাচনে জয়ী হবেন। বাস্তবেও তাই ঘটেছিলো।

ইউনিভ্যাক বা ইউনিভার্সাল অটোমেটিক সিকোয়েন্স কম্পিউটার

১৩. কম্পিউটার দ্রুত রিস্টার্ট করার জন্য আমরা কী বোর্ডের Ctl, Alt ও Del একসাথে চেপে নির্দেশ প্রদান করি। এই কী সিকোয়েন্সের কোড প্রণয়ন করেন ডেভিড ব্র্যাডলি (David Bradly) নামের এক প্রোগ্রামার। তিনি মাইক্রোসফটের হয়ে কাজ করছিলেন।

১৪. ইউএস নিউজ এন্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট (US News and World Report) নামক পত্রিকা সর্বপ্রথম প্রতি সংখ্যায় পত্রিকার ইমেইল অ্যাড্রেস (E-mail address) মুদ্রণের প্রথা চালু করে।

১৫. ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের টোকিও নগরে বোমা বিস্ফোরণে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি বাড়িতে রেডিও মেরামত করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানটিই বিশ্বখ্যাত সনি ইনকর্পোরেটেড (Sony Incorporated) নামক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর এর নাম ছিল টোকিও শুসিন কোগিও কে. কে.। এর ইংরেজি রূপ হয় টোকিও টেলিকমিউনিকেশনস ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন।

১৬. বিশ্বের সর্বপ্রথম সার্চ ইঞ্জিনের নাম 'আর্চি'। এটি আর্কাইভার শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৯৮৯ সালে কানাডার মন্ট্রিয়ালে এই সার্চ ইঞ্জিনের জন্ম হয়। এই তৈরি করেছিলেন পিটার ডয়েশ।

১৭. আবিষ্কারের ধারাবাহিকতায় তথ্য আদান-প্রদানের অন্যতম তিনটি মাধ্যম হলো – রেডিও, টেলিভিশন ও ইন্টারনেট। ইতিহাস খুঁজে দেখা গেছে, ৫ কোটি ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছানোর জন্য রেডিও–র লেগেছে ৩৮ বছর, টেলিভিশনের ১৩ বছর আর ইন্টারনেটের মাত্র ৫ বছর।

১৮. চলচ্চিত্রে কম্পিউটার বা কম্পিউটারনির্ভর বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার দীর্ঘদিনের। তবে বিশ্বের সর্বপ্রথম পরিপূর্ণভাবে কম্পিউটার জেনারেটেড ফিচার ফিল্ম হচ্ছে 'টয় স্টোরি'। এই ফিল্মটি তৈরি করার জন্য ৮৭টি ডুয়াল সিপিইউ স্পার্ক স্পেশন, ২০, ৩০টি ৪-সিপিইউ স্পার্ক স্টেশন ২০ এবং একটি স্পেস সার্ভার ১০০ কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৯. ১৯৭৮ সালে অ্যাপল ইনক্ (Apple Inc.) সর্বপ্রথম তাদের তৈরি কম্পিউটারে ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভ ব্যবহার শুরু করেন।

২০. কম্পিউটারে ব্যবহারযোগ্য ডিস্ক বা ডিস্কেট (portable diskor diskette) সর্বপ্রথম তৈরি হয় ১৯৭১ সালে।

২১. ডগলাস ইঙ্গেলবার্ট (Douglas Engelbart) নামক একজন প্রযুক্তিবিদ ১৯৬৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর সান ফ্রান্সিসকোর জয়েন্ট কম্পিউটার এক্সপো-তে সর্বপ্রথম কম্পিউটার মাউস জনসমক্ষে প্রকাশ করেন।

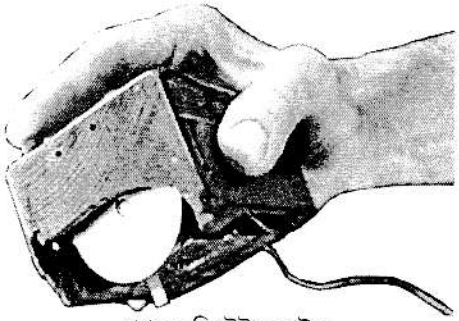

প্রথম কম্পিউটার মাউস

২২. ১৯৮৫ সালের জুন মাসে টপ লেভেল ডোমেইন .gov-এর অধীনে সর্বপ্রথম সে ওয়েবসাইটটি রেজিস্ট্রি করা হয়, তার নাম css.gov।

২৩. ১৯৮৫ সালের ১৫ই মে টপ লেভেল ডোমেইন .com-এর অধীনে সর্বপ্রথম সে ওয়েবসাইটটি রেজিস্ট্রি করা হয়, তার নাম symbolics.gov।

২৪. ইন্টারনেট যোগাযোগের জন্য বর্তমানে সাবমেরিন কেবল ব্যবহার করা হচ্ছে। সাগর-মহাসাগরের তলদেশ দিয়ে যে কেবল বসিয়ে টেলিযোগাযোগ বা ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে, তাকে সাবমেরিন টেলিকমিউনিকেশন কেবল (submarine telecommunication cable) বলে। ১৮৩৯ সালে সর্বপ্রথম আটলান্টিক মহাসাগরে এই কেবল স্থাপনের কাজ শুরু হয়।

সাবমেরিন টেলিকমিউনিকেশন কেবল

২৫. ১৮৫০ সালে ওয়াটকন ব্রেট ও তাঁর প্রতিষ্ঠান অ্যাংলো ফ্রেঞ্চ টেলিগ্রাফ কোম্পানি (French Telegraph Company) সাধারণ তামার তার (copper wire) দিয়ে ইংলিশ চ্যানেলে প্রথম বাণিজ্যিক সাবমেরিন কেবল (commercial submarine cable) স্থাপনের কাজ শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে একে শুধু টেলিগ্রাফ আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হতো।

২৬. ডগলাস ইঙ্গেলবার্ট (Douglas Engelbart) নামক একজন প্রযুক্তিবিদ ১৯৬৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর সান ফ্রান্সিসকোর জয়েন্ট কম্পিউটার এক্সপো (Joint Stock Expo)-তে সর্বপ্রথম কম্পিউটার মাউস (mouse) জনসমক্ষে প্রকাশ করেন।

২৭. ডগলাস ইঙ্গেলবার্ট (Douglas Engelbart) নামক একজন প্রযুক্তিবিদ ১৯৬৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর সান ফ্রান্সিসকোর জয়েন্ট কম্পিউটার এক্সপো-তে সর্বপ্রথম হাইপারটেক্সট (hypertext) জনসমক্ষে প্রকাশ করেন।

ডগলাস ইঙ্গেলবার্ট

২৮. ১৮৫৮ সালে সাইপ্রাস ফিল্ড (Cyprus Field) নামক প্রতিষ্ঠানটি প্রথম ট্রান্স আটলান্টিক সাবমেরিন কেবল স্থাপন করে।

২৯. বিশ্বের সর্বপ্রথম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের (Internet Service Provider) নাম কম্পুসার্ভ (Compuserv)। বর্তমানে এটি আমেরিকান অনলাইনের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে।

৩০. ১৯৮৯ সালে বিশ্বের সর্বপ্রথম অনলাইন ইলেকট্রনিক ব্যাংক (Online Electronic Bank) সৃষ্টি হয় লি স্টাইনের (Le Stine) পরিচালনায়। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন ফাস্ট ভার্চুয়াল ব্যাংক (First Virtual Bank)।

৩১. ডগলাস ইঙ্গেলবার্ট (Douglas Engelbart) নামক একজন প্রযুক্তিবিদ ১৯৬৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর সান ফ্রান্সিসকোর জয়েন্ট কম্পিউটার এক্সপো-তে সর্বপ্রথম ডাইনামিক ফাইল লিংকিং (dynamic file linking) জনসমক্ষে প্রকাশ করেন।

৩২. ফিনল্যান্ডের নকিয়া নামক শহরের নামে বিশ্বসেরা মোাইল ফোন কোম্পানি নকিয়া (Nokia)-র নাম রাখা হয়েছে। আর নকিয়া শহরটির নাম রাখা হয়েছে শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী নকিয়ানভিরটা (Nokianvirta)-র নামানুসারে।

৩৩. ১৯৮০ সাল থেকে সাবমেরিন কেবল (submarine cable)-এ অপটিক্যাল ফাইবার (optical fibre) ব্যবহার করা হচ্ছে।

৩৪. ডগলাস ইঙ্গেলবার্ট (Douglas Engelbart) নামক একজন প্রযুক্তিবিদ ১৯৬৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর সান ফ্রান্সিসকোর জয়েন্ট কম্পিউটার এক্সপো (Joint Computer Expo)-তে সর্বপ্রথম টেলিকনফারেন্সিং (teleconferencing) জনসমক্ষে প্রকাশ করেন।

৩৫. সেলফোনের সর্বপ্রথম ভাইরাসের নাম কাবির.এ (Cabir.A)। এটি ২০০৪ সালে প্রথমবারের মতো সেলফোন আক্রমণ করে।

৩৬. ২০০৮ সালে সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রের ডিভিডি বিক্রির রেকর্ডকে ছাড়িয়ে বিক্রয় হয় ভিডিও গেম।

৩৭. বিশ্বের সর্বপ্রথম ই-মেইল পাঠানো হয় আজ থেকে প্রায় ৩৯ বছর আগে, ১৯৭২ সাল।

বৈদিক গাণিতিক সূত্র

সনাতন ধর্মের অন্যতম প্রধান ধর্মগ্রন্থ অথর্ববেদসহ অন্যান্য বেদ ও উপনিষদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করে বেদিক গণিতে যেসব সূত্র বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে সংগ্রহ করে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই সূত্রগুলো প্রধান সূত্র এবং উপসূত্র – এই দুটি ভাগে বিভক্ত।

সূত্রগুলো প্রাথথিক অবস্থায় প্রধান সূত্রে মোট ১৬টি এবং উপসূত্র রয়েছে ১৪টি। নিচে এসব সূত্র এবং উপসূত্রে মূল দেবনাগরী ভাষা এবং ইংরেজি ভাষায় উল্লেখ করা হলো-

প্রধান সূত্রসমূহ (The main Sutras)

সূত্র	অর্থ
एकाधिकेन पूर्वेन	পূর্বের চেয়ে একটি বেশির মাধ্যমে
निखिलं नवतश्चरमं दशतः	সবই ৯ থেকে এবং শেষেরটি ১০ থেকে
ऊर्ध्वतिर्यग्भ्यामं	অনুলম্বিক এবং আড়াআড়িভাবে
परावर्त्य योजयेत्	পারস্পরিক স্থান পরিবর্তন ও প্রয়োগ
शून्यं साम्यसमुच्चये	সমুচ্চয় যদি সমান হয়, তবে তা শূন্য
आनुरूप्ये शून्यं अन्यत्	এক অনুপাত হলে অপরটি হবে শূন্য
संकलन व्यवकलनाभ्यां	যোগের মাধ্যমে এবং বিয়োগের মাধ্যমে
पूरणापूरणाभ्यां	পরিপূরণ বা অপরিপূরণের মাধ্যমে
चलनकलनाभ्याम	ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস
यावदूनं	সংখ্যা হ্রাসের মাধ্যমে
व्यष्टिसमष्टिः	নির্দিষ্ট এবং সাধারণ
शेषाण्यङ्केन चरमेण	পরমার্থিক এবং উপান্তের দ্বিগুণ
सोपान्त्यद्वयमन्त्यं	শেষ সংখ্যা দিয়ে নিরবশেষ
एकन्यूनेन पूर्वेन	পূর্বের চেয়ে একটি কমের মাধ্যমে
गुणितसमुच्चयः	যোগের ফল
गुणकसमुच्चयः	সকল বহুগুণক

উপসূত্রসমূহ (The sub Sutras)

উপসূত্র	অর্থ
आनुरूप्येण	সমানুপাতিকভাবে
शिष्यते शेषसंज्ञः	অবশিষ্ট ধ্রুব থাকে
आद्यमाद्येनान्त्यमन्त्येन	প্রথমেরটি প্রথমটি দিয়ে এবং শেষেরটি শেষটি দিয়ে
केवलैः सप्तकं गुण्यात्	৭ এর জন্য বহুগুণক হলো ১৪৩
वेष्टनम्	অসকুলেশন দিয়ে
यावदूनं तावदूनं	ন্যূন দিয়ে হ্রাস করা
यावदूनं तावदूनीकृत्य वर्गं च योजयेत्	
अन्त्ययोर्दशकेऽपि	শেষ যোগফল ১০
अन्त्ययोरेव	কেবল শেষ মেয়াদ
समुच्चयगुणितः	ফলাফলের যোগফল
लोपनस्थापनाभ्यां	পরিবর্ত বর্জন ও ধারণ
विलोकनं	নিছক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে
गुणितसमुच्चयः समुच्चयगुणितः	যোগের ফল হলো ফলের যোগ
ध्वजाङ्क	পতাকার উপরে

প্লাস্টিক সংখ্যা

গণিতের রাজ্যে প্লাস্টিক সংখ্যা (Plastic number) বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক একটি গাণিতিক ধ্রুব সংখ্যা। একে শুধু প্লাস্টিক ধ্রুবকও (Plastic constant) বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে $x^3 = 1 + 1$ সমীকরণটি সমাধান করে x –এর যে মান পাওয়া যায়, সেটাই প্লাস্টিক সংখ্যা। এই সংখ্যাটিকে p দিয়ে বোঝানো হলে, যে সমীরকরণটি পাওয়া যায়, তা হলো–

$$p = \sqrt[3]{\frac{1}{2}+\frac{1}{6}\sqrt{\frac{23}{3}}} + \sqrt[3]{\frac{1}{2}-\frac{1}{6}\sqrt{\frac{23}{3}}}$$

এই p-এর মানকে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করা হলে, মোটামুটিভাবে যে মান দাঁড়ায় তা হলো প্রায় ১.৩২৪৭১৭৯৫৭২৪৪৭৪৬০২৫৯৬০৯০৮৮৫৪। মাঝে মাঝে এই প্লাস্টিক সংখ্যাকে সিলভার সংখ্যাও (Silver number) বলে। অবশ্য এই নামটি সিলভার অনুপাত বা $1+\sqrt{2}$ বোঝানোর জন্যই বেশি ব্যবহৃত হয়।

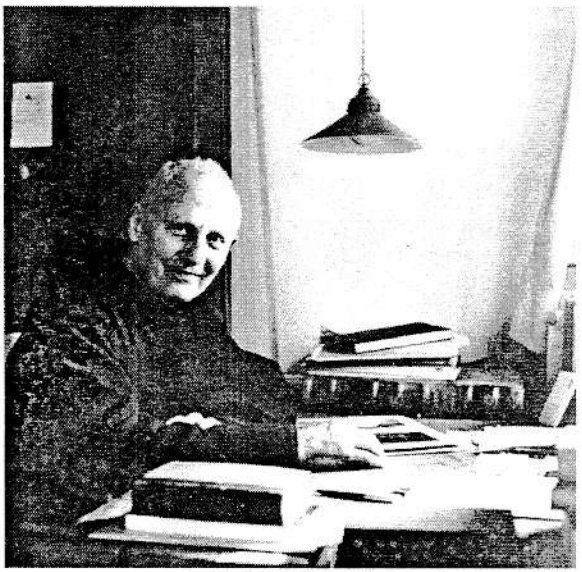

ডম হ্যান্স ভন ডার লান

১৯২৮ সালে ডাচ গণিতবিদ ডম হ্যান্স ভন ডার লান (Dom Hans van der Laan) এই সংখ্যাটির নামকরণ করেন। অবশ্য ডেনিশ ভাষায় এর মূল নামটি হলো *প্লাস্টিশে জেটাল* (*plastische getal*)। সোনালী অনুপাত (Golden Ratio) বা

রূপালী সংখ্যা যেভাবে নামকরণ করা হয়েছে, তার চেয়ে ব্যতিক্রম থেকেই প্লাস্টিক সংখ্যার নামকরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কোনো পদার্থকে বোঝানো হয় না, বরং এর বিশেষণিক অর্থ (adjectival sense) মাথায় রেখেই এমনভাবে নামকরণ করা হয়েছে, যাতে কোনো পদার্থের ত্রিমাত্রিক আকার বোঝানো যায়। তবে শুধু $x^3 = 1 + 1$ সমীকরণটিই প্লাস্টিক সংখ্যা হিসেবে পরিচিত নয়। কিন্তু নিচের সমীকরণগুলোর সমাধানও প্লাস্টিক সংখ্যা।

$$x^5 = x^4 + 1$$
$$x^5 = x^2 + x + 1$$
$$x^6 = x^2 + 2x + 1$$
$$x^6 = x^4 + X + 1$$
$$x^7 = 2x^6 - 1$$
$$x^7 = 2x^4 + 1$$
$$x^8 = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$
$$x^9 = x^6 + x^4 + x^2 + x + 1$$
$$x^{12} = x^{10} - x^4 - 1$$
$$x^{14} = 4x^9 + 1$$

প্লাস্টিক সংখ্যাই সবচেয়ে ছোট পিসো-বিজয়রাঘবন সংখ্যা (Pisot-Vijayaraghavan number)।

এনিয়াক

সময়টা ১৯৪৫ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে। বিশ্ব জুড়ে কেবল ধ্বংস আর ধ্বংস।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মুর স্কুল অব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (Moore School of Electrical Engineering)-এর জন ডব্লিউ. মউসলে (John W. Mauchly) এবং জে. প্রেসপার (J. Presper Eckert) এবং তাঁদের দল মার্কিন সেনাবাহিনীর ব্যালিস্টিক রিসার্চ ল্যাবের জন্য একটি গোপণীয় প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছিলেন। এই প্রজেক্টেই তারা তৈরি করেন এনিয়াক (ENIAC) নামের এক বিশেষ ধরনের যন্ত্র। এনিয়াক শব্দের পূর্ণ অর্থ হলো ইলেকট্রনিক নিউমেরিক্যাল ইনটিগ্রেটর এন্ড ক্যালকুলেটর (Electronic Numerical Integrator and Calculator)।

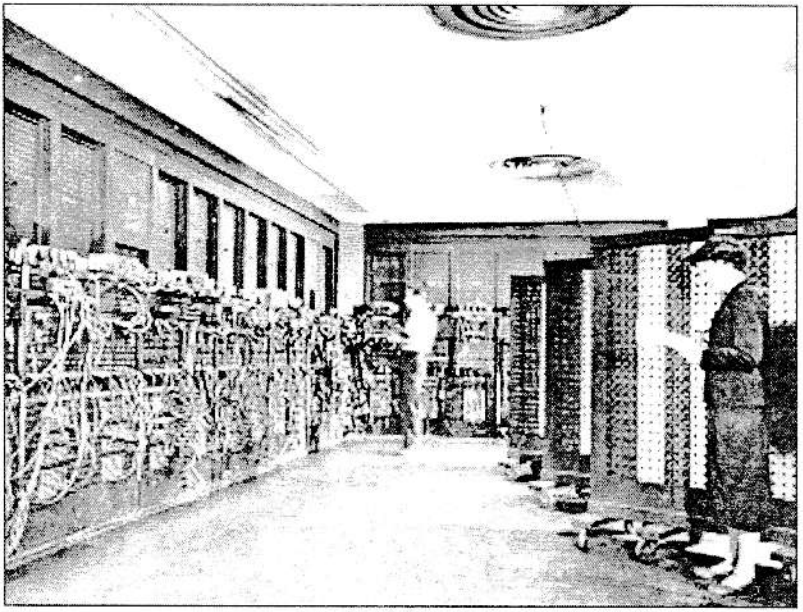

এনিয়াক কম্পিউটার

মউচলি ১৯৪২ সালের দিকে একটি সভায় বলেছিলেন যে, সে সময় যেসব ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা হতো, ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহার করে সেই গণনা করার গতি অনেক গুণ বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। তাঁর এই বক্তব্য মার্কিন

সেনাবাহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, তারা মউচলিকে এই গবেষণা কাজ করার দায়িত্ব দেয়। কারণ মউচলির এই ঘোষণার সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল আর মার্কিন সেনাবাহিনীও এ ধরনের গণনার কাজ বেশি প্রয়োজন হচ্ছিল। সেসময় যেসব ক্যালকুলেটর ব্যবহৃত হতো, সেগুলো ব্যবহার করে এসব গণনার কাজ করতে একজন সেনাসদস্যের বেশ কয়েকদিন লেগে যেত। অবশ্য ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে যখন এনিয়াক তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।

সেনাবাহিনীর আহ্বানে তৈরি করা এই প্রজেক্টেই মউচলি ও একার্ট এবং তাদের দল তৈরি করেন এনিয়াক (ENIAC) নামের এক বিশেষ ধরনের গণক যন্ত্র। এনিয়াক শব্দের পূর্ণ অর্থ হলো ইলেকট্রনিক নিউমেরেটর ইন্ট্রিগেটর অ্যানালাইজার এন্ড কম্পিউটার (Electronic Numerator Integrator Analyser and Computer)। বলা হয়, কম্পিউটার বিশ্বের সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক ডিজিটাল কম্পিউটার এই এনিয়াক (ENIAC)।

এনিয়াকের ওজন ছিল ৩০ টন, উচ্চতায় ছিল ১৮ ফুট এবং লম্বায় ছিল ৮০ ফুট। এটি প্রায় ১,০০০ বর্গফুটের একটি ঘরের পুরোটাই জুড়ে ছিল। এটি দেখতে অনেকটা প্রাচীনকালের সায়েন্স ফিকশন সিনেমায় দেখানো বিশালাকার কম্পিউটারের মতোই ছিল।

এই কম্পিউটারটি চালু করার জন্য এই যন্ত্রে ১৩০ থেকে ১৪০ কিলোওয়াট শক্তির প্রয়োজন হতো। এতে ১৭,৪৬৮টি ভ্যাকুয়াম টিউব (vacuum tubes), ৭০,০০০ রেজিস্টর (resistors), ১০,০০০ ক্যাপাসিটর (capacitors) এবং প্রায় ৫ লক্ষ সংযোগ। এটি তৈরি করার জন্য সেই সময়ই প্রয়োজন হয়েছিল প্রায় ৪,৮৭,০০০ ডলার। এটি প্রতি সেকেন্ডে ৫,০০০ যোগ করতে পারত। বর্তমানকালের তুলনায় এটি তেমন উল্লেখযোগ্য করার মতো নয়। তবে সেসময় যেসব ক্যালকুলেটর ছিল, সেগুলোর চেয়ে প্রায় হাজার গুণ গতিসম্পন্ন ছিল।

সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, এনিয়াক যা কাজ করত, তা করার জন্য বর্তমানকালের যন্ত্রপাতির আকার অনেকটা তাস খেলার কার্ডের মতো হলেই চলবে। বর্তমানকালের কম্পিউটার এনিয়াকের তুলনায় প্রায় ৫০ হাজার গুণ দ্রুত এবং এনিয়াক যতটুকু তথ্য ধারণ করতে পারতো, তার চেয়ে প্রায় ১০ লক্ষ বা তার চেয়েও বেশি তথ্য ধারণ করতে পারে। এনিয়াকের ঘড়ির গতি ছিল ১০০ কিলোহার্টজ। তবে আধুনিক কম্পিউটারের মতো এনিয়াকে কোনো প্রোগ্রামিং কমান্ড দেয়া বা সংরক্ষণ করা যেত না।

গুণ করা

গুণ অংকেরই এক মজার রহস্য। গুণের বহু রহস্য। বলা যায়, সবগুলোই কিন্তু বেশ মজার। দেখবে? তবে দেখ–

প্রথমেই ৯-এর কথা বলি।

মজার কাণ্ড কি জানো, ৯ সংখ্যাটি দিয়ে তুমি যাকেই গুণ করো না কেন, যে সংখ্যাটি পাবে, তার একক সংখ্যাগুলো যোগ করে দেখ, উত্তর হিসেবে ৯-ই পাবে। দেখবে–

১ × ৯ = ৯
২ × ৯ = ১৮ (১ + ৮ = ৯)
৩ × ৯ = ২৭ (২ + ৭ = ৯)
৪ × ৯ = ৩৬ (৩ + ৬ = ৯)
৫ × ৯ = ৪৫ (৪ + ৫ = ৯)
৬ × ৯ = ৫৪ (৫ + ৪ = ৯)
৭ × ৯ = ৬৩ (৬ + ৩ = ৯)
৮ × ৯ = ৭২ (৭ + ২ = ৯)
৯ × ৯ = ৮১ (৮ + ১ = ৯)
১০ × ৯ = ৯০ (৯ + ০ = ৯)

মজার, তাই না?

স্টোনহেঞ্জ

বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগেও মানুষের কাছে একটি রহস্যময় বিষয় হয়ে রয়েছে স্টোনহেঞ্জ (Stonehenge)। প্রাচীনকালের এই স্থাপত্যটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে উইল্টশায়ার ইংলিশ কাউন্টিতে। এটি এমেসবারি (Amesbury) থেকে প্রায় ৩.২ কিলোমিটার (২.০ মাইল) পশ্চিমে এবং স্যালিসবারি (Salisbury) থেকে ১৩ কিলোমিটার (৮.১ মাইল) উত্তরে অবস্থিত।

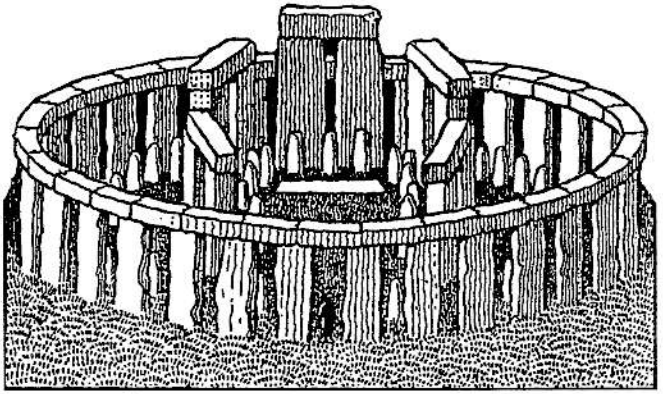

প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণায় স্টোনহেঞ্জের মূল নকশা (পার্শ্ব দৃশ্য)

এই স্টোনহেঞ্জ–এর মধ্যে রয়েছে–

১. একটি বলয়াকৃতির পাথরের চক্র, যার ব্যাস প্রায় ৯১.৫ মিটার (৩০০ ফুট)।

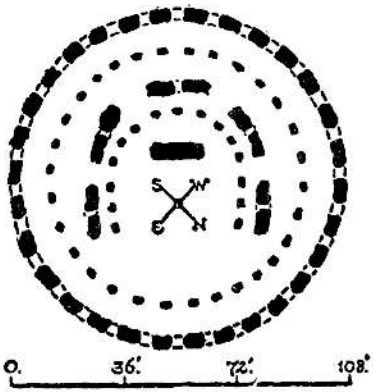

স্টোনহেঞ্জের সম্ভাব্য মূল নকশা ও পরিমাপ (উপর থেকে তোলা ছবি)

২. পাথর বাঁধানো একটি রাস্তা, যা উত্তর–পূর্ব দিকে এগিয়ে গেছে।

৩. এর মাঝে রয়েছে একটি সারসেন পাথর, যাকে হেলে স্টোন (Hele Stone) বা ফ্রায়ার'স হিল (Friar's Heel) বলা হয়।

স্টোনহেঞ্জের হেলে স্টোন

৪. পাথরের চক্রের ভেতরে রয়েছে একটি শোয়ানো পাথরের আয়তাকার খণ্ড, যাকে 'বধ করার পাথর' (Slaughtering Stone) বলে।

স্টোনহেঞ্জের বর্তমান ভগ্নপ্রায় অংশ

৫. দুটি নিরেট আকৃতির ছোট পাথরের সারসেন অর্থাৎ পাথরের আয়তাকার খণ্ড, যেগুলো পাথরের চক্রের উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্বদিকে শোয়ানো অবস্থায় স্থাপিত।

৬. চক্রাকারে স্থাপিত লম্বিকভাবে দণ্ডায়মান পাথরের উপর সারি বেঁধে রাখা ছোট আকারের পাথরের একটি বলয়। এই বলয়ের প্রতিটি পাথরই পরস্পরের সাথে জোড়বদ্ধ। সর্বমোট ৩০টি পাথরের মধ্যে বর্তমানে স্টোনহেঞ্জের ভগ্নপ্রায় অবস্থায় মাত্র ১৬টি পাথর দেখা যায়।

৭. অপেক্ষাকৃত কম স্থূল ধরনের বলয় দেখা যায়, যা ৩০ থেকে ৪০টি পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। অবশ্য বর্তমানে এই বলয়ের মাত্র ৭টি পাথর লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও অন্য ৯টি বাইরে দিকে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

৪. বহিঃস্থ পাথর দিয়ে তৈরি অশ্বক্ষুরাকৃতির পাথরের স্থাপনা। মূল অবস্থায় ১৫টি বা তার চেয়ে বেশি সংখ্য পাথর প্রায় ৮ ফুট উচ্চতায় স্থাপন করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হলেও বর্তমানে এদের মাত্র কয়েকটি অবিকৃত রয়েছে।

9. একটি মাইকাযুক্ত বেলে পাথর, যাকে 'পরিবর্তক পাথর' (Altar Stone) বলে।

ধারণা করা হয়, এই স্টোনহেঞ্জ দিয়ে প্রাচীনকালের মানুষে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করতো। কিন্তু ঠিক কিভাবে এটি ব্যবহার করা হতো, তা সঠিকভাবে আজো জানা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগেও এই স্টোনহেঞ্জ–এর সম্পূর্ণ রহস্য মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি!

৯-এর রহস্যময় গুণ

গণিতে ৯-এর রহস্যময়তা অনেক বেশি।

এই ৯ সংখ্যা দিয়ে মজার এক গুণ করা যাক, অবাক হয়ে দেখবে এই সংখ্যাটির অলৌকিক বৈশিষ্ট্য–

তাহলে মজা দেখো–

৯	×	৯	+	৭	=	৮৮
৯৮	×	৯	+	৬	=	৮৮৮
৯৮৭	×	৯	+	৫	=	৮৮৮৮
৯৮৭৬	×	৯	+	৪	=	৮৮৮৮৮
৯৮৭৬৫	×	৯	+	৩	=	৮৮৮৮৮৮
৯৮৭৬৫৪	×	৯	+	২	=	৮৮৮৮৮৮৮
৯৮৭৬৫৪৩	×	৯	+	১	=	৮৮৮৮৮৮৮৮
৯৮৭৬৫৪৩২	×	৯	+	০	=	৮৮৮৮৮৮৮৮৮
৯৮৭৬৫৪৩২১	×	৯	-	১	=	৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮

রহস্যময়! তাই না?

@ রহস্য

ইন্টারনেটের ভুবনে যাদের বিচরণ তাদের কাছে @ প্রতীকটি খুবই পরিচিত। ই–মেইল (e-mail) বা ইলেকট্রনিক মেইলে (electronic mail) কোনো ব্যক্তির পরিচিত বা অ্যাড্রেস (address) নির্দিষ্ট করা জন্য এই প্রতীকটি ব্যবহার করা হয়। ই–মেইল হলো কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে বার্তা পাঠানোর এক বিশেষ পদ্ধতি। প্রথম ই–মেইলটি প্রেরণ করা হয় অর্পানেট (ARPANET) বা অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সি নেটওয়ার্ক (Advanced Research Project Agency Network) ব্যবহার করে। @ প্রতীকটি ব্যবহার করে ই-মেইল অ্যাড্রেস লেখা হয় এভাবে – aparesh_2004@yahoo.com।

@ প্রতীক চিহ্ন

তবে এই প্রতীকটি কিন্তু সরাসরিভাবে সৃষ্টি হয়নি। নিচে প্রতীকের বিবর্তনের ধারাক্রম দেখানো হলো–

ই-মেইল ঠিকানা লেখার জন্য ব্যবহৃত @ প্রতীকের বিবর্তন

যাহোক, ধারণা করা হয়, ১৯৭১ সালে বিবিএন–এর কম্পিউটার প্রকৌশলী রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিসন (Raymond Samual Tomlinson) এই প্রতীকটি ই-মেইলের ঠিকানা লেখার জন্য ব্যবহার করেন।

ইমেইলে @ প্রতীক ব্যবহারের উদ্যোক্তা রে টমলিসন

ইমেইলে ব্যবহার করার আগে এই @ প্রতীকটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন–

দেশ		নাম
ইংল্যান্ড	:	অথবা
চীন	:	ছোট ইঁদুর
ডেনমার্ক	:	হাতির শুঁড়
সুইডেন	:	হাতির শুঁড়
জার্মান	:	মাকড়শা বানর
ইটালি	:	শামুক
ইসরায়েল	:	স্ট্রডেল
চেকোশ্লোভাকিয়া	:	রোলমপস

গণিতে গ্রিক বর্ণ

গণিতের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। গণিত শাস্ত্রে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাষার অসংখ্য বর্ণ যুক্ত হয়ে একে আরো অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো ভাষা হিসেবে পরিচিত ভাষা গ্রিক ভাষা। এই ভাষাটি মূলত ২৪টি বর্ণ দিয়ে গঠিত।

ধারণা করা হয়, অষ্টম খ্রিষ্টপূর্বের শেষ বা নবম খ্রিষ্টপূর্বের প্রথম দিক থেকেই এই ভাষা বিশ্বে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। মূলত সেই সময় থেকে গ্রিক ভাষার শব্দসমূহ গণিতের রাজ্যে নিজের স্থান দখল করে নিতে সমর্থ হয়। আজও এসব গ্রিক বর্ণ গণিতে সমান মর্যাদায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এখানে গণিতশাস্ত্রে সচরাচর ব্যবহৃত গ্রিক বর্ণসমূহের একটি তালিকা দেওয়া হলো–

বাংলা উচ্চারণ	ইংরেজি উচ্চারণ	গণিত শাস্ত্রে ব্যবহৃত বর্ণ
১. আলফা	Alpha	$A\alpha$
২. বিটা	Beta	$B\beta$
৩. চাই	Chi	$X\chi$
৪. ডেল্টা	Delta	$\Delta\delta$
৫. এপসিলন	Epsilon	$E\varepsilon$
৬. ইটা	Eta	$H\eta$
৭. গামা	Gamma	$\Gamma\gamma$
৮. আয়োটা	Iota	$I\iota$
৯. কাপ্পা	Kappa	$K\kappa$
১০. ল্যাম্বডা	Lambda	$\Lambda\lambda$
১১. মিউ	Mu	$M\mu$
১২. নিউ	Nu	$N\nu$
১৩. ওমেগা	Omega	$\Omega\omega$
১৪. অমিক্রন	Omicron	Oo

১৫. ফাই	Phi	Φφ
১৬. পাই	Pi	Ππ
১৭. সাই	Psi	Ψψ
১৮. রো	Rho	Ρρ
১৯. সিগমা	Sigma	Σσς
২০. তাউ	Tau	Ττ
২১. থিটা	Theta	Θθ
২২. আপসিলন	Upsilon	Υυ
২৩. জি	Xi	Ξξ
২৪. জিটা	Zeta	Ζζ

সুপারকম্পিউটার : বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পিউটার

সুপারকম্পিউটার এক বিশেষ ধরনের কম্পিউটার, যা অন্য সব কম্পিউটারের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং অনেক বেশি দ্রুতগতিতে কাজ করে। প্রতিনিয়ত কম্পিউটারের কার্যকারিতা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে অনেক কম্পিউটার প্রোগ্রামার মনে করছেন যে, আজকের দিনের সুপারকম্পিউটার হয়তো ভবিষ্যতে সাধারণ কম্পিউটার মানে এসে পৌঁছবে।

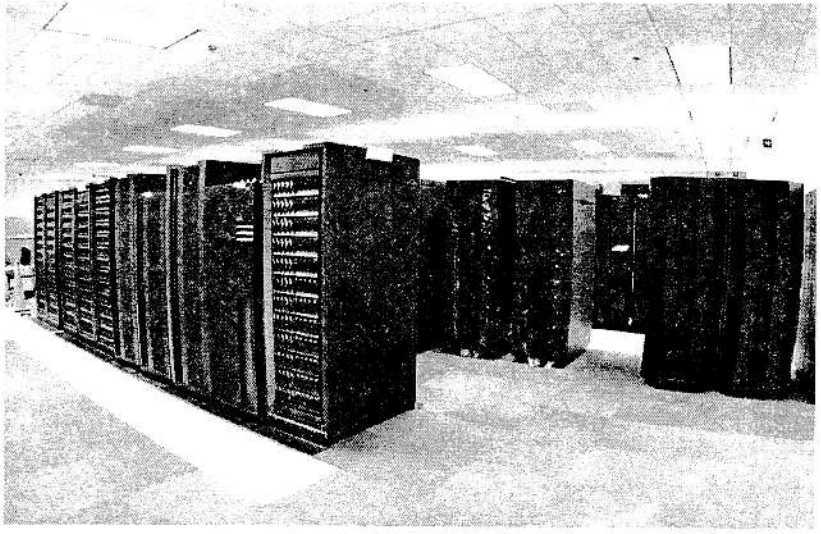

সুপারকম্পিউটার

১৯২৯ সালের দিকে সর্বপ্রথম সুপারকম্পিউটারের ধারণা মাথায় আসে নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড (New York World)–এর। আইবিএম–এর পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি ট্যাবুলেটরের কার্যকারিতায় সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কারণেই এই সুপারকম্পিউটারের ধারণা প্রথম উদ্যোক্তাদের চিন্তায় আসে।

১৯৬০ সালে কন্ট্রোল ডাটা করপোরেশনে (Control Data Corporation (CDC) কম্পিউটার বিজ্ঞানী সেইমুর ক্রে (Seymour Cray) প্রথমবারের মতো সুপারকম্পিউটার ডিজাইন করেন। কিন্তু এই কম্পিউটারটি কখনই বাজারজাত করা হয়নি। এর কিছুকাল পরেই ক্রে এই প্রতিষ্ঠানটি ছেড়ে দিয়ে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ক্রে রিসার্চ ইনকর্পোরেটেড (Cray Research Incorporated) গড়ে তোলেন। নিজস্ব প্রতিষ্ঠান থেকেই তিনি 'ক্রে সুপারকম্পিউটার' (Cray

Supercomputer) নামে বিভিন্ন কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় শুরু করেন। এটি ১৯৭০ সালের ঘটনা।

ক্রে রিসার্চ ইনকর্পোরেটেড–এ তৈরি প্রথম সুপারকম্পিউটারের নাম ক্রে ১ সুপারকম্পিউটার (Cray 1 supercomputer)। এতে ২,০০,০০০ সমন্বিত বর্তনী বা ইনটিগ্রেটেড সার্কিট ছিল। এটি প্রতি সেকেন্ডে ১০০ মিলিয়ন ফ্লোটিং পয়েন্ট অপারেশন (100 million floating point operations per second, 100 MFLOPS) করতে সক্ষম ছিল।

এরপরে তিনি সুপারকম্পিউটার নতুন নতুন ডিজাইন বানিয়ে বাজারজাত করতে শুরু করেন এবং ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে রাখেন।

ক্রে সুপার কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য

সুপারকম্পিউটার নানা ধরনের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্টমণ্ডিত থাকে। যেমন–

- সুপার কম্পিউটার ব্যবহারকারীর ইচ্ছা অনুযায়ী তৈরি করা হয়।
- অসংখ্য কম্পিউটার যন্ত্রাংশ তৈরিকারক প্রতিষ্ঠান থেকে সবচেয়ে ভালো ও উন্নতমানের যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করে সুপারকম্পিউটার তৈরি করা হয়।
- অধিকাংশ সুপার কম্পিউটার অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ও সুদক্ষ লিনাক্স বা ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে পরিচালিত হয়।
- অত্যন্ত শক্তিশালী।
- খুব দ্রুতগতিতে পরিচালিত হয়।
- অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক ও দক্ষ।
- একাধিক প্রসেসর থাকতে পারে।
- সমস্যাহীনভাবে হয়ে চলতে পারে।
- কম্পিউটার সুষমভাবে পরিচালিত হওয়ার লক্ষ্যে পৃথক শীতলীকরণ যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়।
- অত্যধিক দামী।
- অপেক্ষাকৃত কম সময়ে অধিক পরিমাণ তথ্য পর্যালোচনা করতে পারে।

কিন্তু তারপরেই ক্রে রিসার্চ–এর একচেটিয়া বাণিজ্যে বাধা পড়ে। নতুন বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সুপারকম্পিউটার নিয়ে বাজারে চলে আসে। যদিও এসব প্রতিষ্ঠান ক্রে রিসার্চের মতো এতো বিশাল ব্যপ্তির নয়, সেহেতু ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই এগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। সার্বিকভাবে সুপারকম্পিউটার মার্কেটে ব্যাপক ধ্বস নামে।

সুপারকম্পিউটার মূলত বিশাল আকারের গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাকাশ কেন্দ্র, বিশাল নেটওয়ার্কে যুক্ত ব্যাংক ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। উচ্চাঙ্গের গবেষণা, বিশাল আকারের হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুপারকম্পিউটার নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিশেষ করে ফ্লুইড ডায়নামিক্স, মহাকাশবিজ্ঞান, পারমাণবিক শক্তিসংক্রান্ত গবেষণা, অ্যানিমেটেড গ্রাফিক্স, পেট্রোলিয়াম সন্ধান, বিশাল আকারের ডাটাবেজ নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কুইপু রহস্য

মনে করা যাক, এমন একটি উন্নত সভ্যতার কথা, যাতে উন্নত এবং আধুনিক সব প্রযুক্তির ছোঁয়ায় মানুষ নিজের জীবনকে বদলে নিয়েছে নানাভাবে। তৈরি করেছে বিশাল সব নগর, তৈরি করেছে বন্দর, নির্মাণ করেছে সুরম্য সব অট্টালিকা, রাস্তা-ঘাট, জল সঞ্চালন পদ্ধতি, ইত্যাদি আরো কত কি? এই সেই সভ্যতা যারা তৈরি করেছে বড় বড় পাথরের তৈরি এমন সব দেওয়াল, যার মধ্যে ছোট একটি ছুরিও প্রবেশ করানো সম্ভব নয়। এরাই করেছে টেক্সটাইল ডিজাইনের মতো জটিল সব চিত্রণের কাজ। এই সভ্যতায় মানুষ পেয়েছে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা, আরাম আয়েশ আর মনোরঞ্জনের উপায়।

শুধু তাই নয়, প্রকৃতি আর প্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে তারা যে শুধু বিস্মিতই থেকেছে, তাই নয়, তারা সেগুলো করায়ত্ব করার চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করেছে সেসবের উত্তর বের করার! আরো আশ্চর্য ও মজার বিষয় কি জানো, অতি উন্নত এই সভ্যতার মানুষেরা খুব সহজেই এসব কাজ করতে পারলেও তাদের কিন্তু কোনো লেখ্য ভাষা ছিল না। তবে বলার জন্য তাদের নিজস্ব ভাষা ছিল বলেই ধারণা করা হয়। বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, এই সাম্রাজ্যে বসবাসকারীরা প্রায় ২০ ধরনের ভাষা ব্যবহার করতো। এই সভ্যতার নাম ইনকা সভ্যতা (Inca Civilization)।

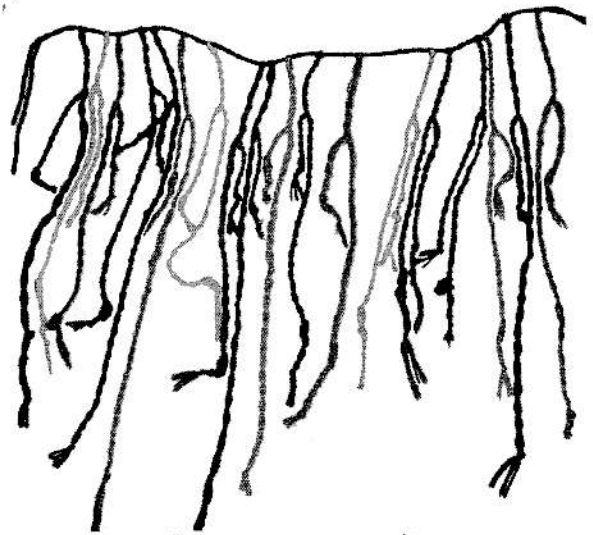

ইনকা সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত কুইপু

ইনকা ছিল দক্ষিণ আমেরিকার অতি প্রাচীনকালের এক সভ্যতা। বিশাল এক সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম কুসকো বা কুজকো (Cusco or Cuzco)। এই বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল ইনকারা। এরাই তৈরি করেছিল কুইপু (quipu)। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি মেমোরি টুল (memory tool)। লম্বা আকারের দড়িতে গিঁট দিয়ে দিয়ে এই কুইপু তৈরি করা হতো। এটি মূলত মানুষ তথা ব্যবহারকারীর স্মরণশক্তিকে বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করতো। অবশ্য সব ধরনের মানুষই কিন্তু এই কুইপু ব্যবহার করতো না। যারা এই কুইপু ব্যবহার করে সমাজ তথা মানুষের উপকারের কাজ করতো, তাদের কুইপু ক্যামাইয়কস' (quipu camayocs) বা 'কুইপুর রক্ষক' (keeper of the quipu) বলা হতো।

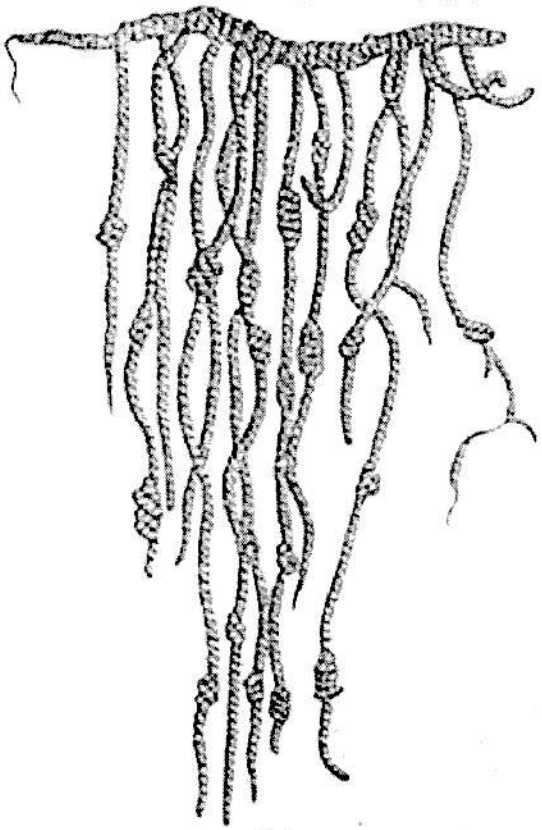

কুইপু

আগেই বলেছি, সেসময়ের মানুষের ব্যবহৃত ভাষার তেমন কোনো লেখ্যরূপ ছিলো না। তাছাড়া বর্তমানে বিশ্বের কোনো কোনো জাদুঘরে প্রাচীন এই কুইপু'র অল্প কিছু নমুনার সন্ধান পাওয়া যায়। ফলে কুইপু প্রকৃতপক্ষে কোন কাজে ব্যবহার করা হতো, তা সঠিকভাবে বলা এককথায় প্রায় দুষ্কর। অবশ্য কোনো কোনো এলাকায় কুইপুর মতো কিছু জিনিস এখনও ব্যবহার করা হয় বলে জানা গেছে। তাই এগুলোর ব্যবহার দেখে প্রাচীন কুইপুর ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কেও একটি ধারণা পাওয়া যায়। তবে ধারণা করা হয়, কুইপুর সাহায্যে কোনো বস্তুর সংখ্যার রেকর্ড রাখা হতো।

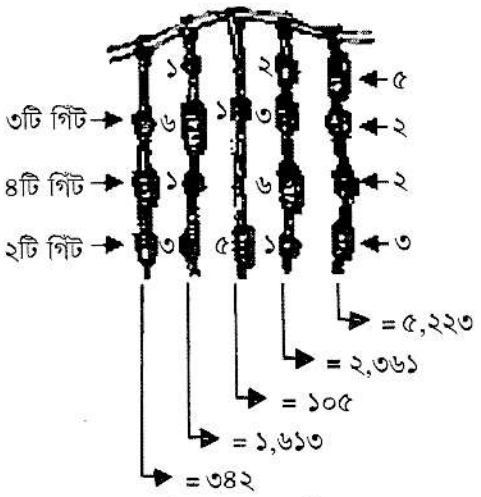

কুইপুর গণনা পদ্ধতি

বিজ্ঞানীদের মতে, কুইপুর দড়িতে বাঁধা গিঁট দিয়েই ইনকাদের সংখ্যা সম্পর্কিত ধারণা বোঝা যায়। ধরা যাক, ১০,৩১,২১,২৪,২১,৩০১।

কিন্তু এক্ষেত্রে অন্য একটি রহস্য রয়েছে। ইনকা সভ্যতার মানুষ সংখ্যা ভিত্তি হিসেবে কি ব্যবহার করতো? গবেষণায় দেখা গেছে, ইনকা সভ্যতার মানুষেরা সংখ্যা ভিত্তি হিসেবে ১০ ব্যবহার করতো। কিন্তু পার্শ্ববর্তী সভ্যতায় সংখ্যা ভিত্তি হিসেবে ৬০ ব্যবহার করতো। তবে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত সঠিক কোনো ইতিহাস আমাদের জানা নেই।

কুইপু তৈরি করা খুবই সোজা। একটি লম্বা মোটা রশির বিভিন্ন অংশে লম্বিকভাবে সরু সুতো গিঁট দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। এরপর রঙিন সুতো দিয়ে সেই সরু সুতোর বিভিন্ন গিঁট বাঁধা হতো। গিঁটগুলো কোথায় দেওয়া

হয়েছে, তার উপর গণনার মান নির্ভর করতো। মোটা রশির কাছাকাছি স্থানের গিঁট হলে তার মান বেশি হয়। যে পদ্ধতিতে এই রশিগুলোতে গিঁট বাঁধা হতো তা যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ বলেই ধারণা করা হয়। কিন্তু এই বিষয়ে কোনো ধরনের লিখিত বর্ণনা পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীরাও এ বিষয়ে সঠিক কোনো ধারণা দিতে পারছেন না।

কোনো কোনো কুইপুর আকার কয়েক ফুট পর্যন্ত লম্বা। একারণেই ধারণা করা যায় যে, বিভিন্ন আকারের কুইপু ব্যবহারীরা বিভিন্ন কাজে, ব্যবসায়, গণনা, বা গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হতো।

১ কেন এক, ২ কেন দুই...

আমরা ১ কে কথা 'এক' বলি. ২ কে বলি 'দুই', ৩ কে বলি 'তিন'.....এভাবে ০ কে বলি 'শূন্য'। কিন্তু কখনও কি আমাদের মনে হয়েছে, কেন এমনটা হয়? সংখ্যাকে এরকম নামকরণের পেছনে যুক্তি কি?

আসলে আমরা যে সংখ্যাগুলো লিখি, যেমন 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 – এগুলো মূলত আরবীয় সংখ্যা। আরবের মুসলিম গণিতবিদরা এসব সংখ্যা ব্যবহারের উপযোগী করে তোলেন। এসব সংখ্যা রোমে ব্যবহৃত রোমান সংখ্যা I, II, III, IV, V, VI..... ইত্যাদি থেকে একেবারেই আলাদা।

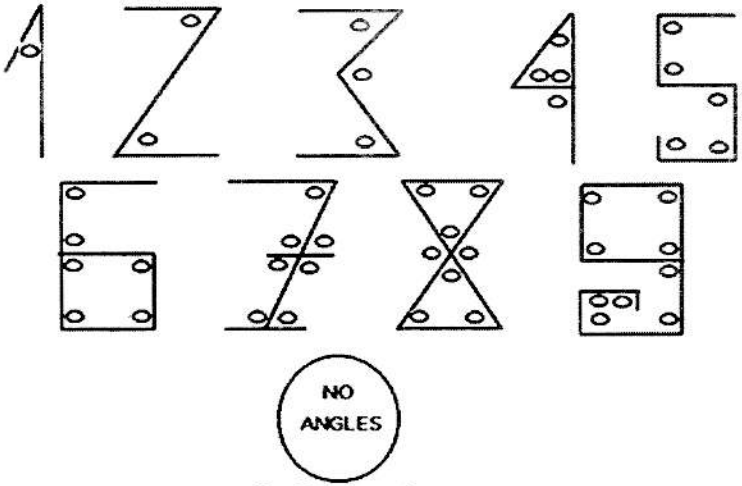

সংখ্যাগুলো আরবের গণিতবিদরা জনপ্রিয় করে তুললেও প্রকৃতপক্ষে এসব সংখ্যা ব্যবহার করতো ফোনেসিয়ান ব্যবসায়ীরা (phoenician traders)। ফোনেসিয়া মূলত আধুনিককালের লেবানন এলাকা। যাহোক, ফোনেসিয়ান ব্যবসায়ীরা আজ থেকে প্রায় ৩,০০০ বছর আগে এরা সিরিয়া এবং লেবাননে বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। ব্যবসায়িক হিসাব-নিকাশ করার কাজেই তারা এসব সংখ্যা ব্যবহার করতেন। তাই এসব সংখ্যাকে অনেকেই ফোনেসিয়ান সংখ্যাও বলে থাকেন।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন জাগে, কেন তারা 1 কে 'এক', 2 কে বলতো 'দুই', 3কে 'তিন'.....ইত্যাদি বলতো। ফোনেসিয়ান এই সংখ্যা লেখার পেছনে যুক্তি কি ছিলো?

গণিতবিদদের ধারণা, ফোনেসিয়ান সংখ্যা লেখা ও বলার পেছনে 'কোণ' প্রধান যুক্তি হিসেবে কাজ করেছে!

গণিতবিদরা লক্ষ করেছেন, ফোনেসিয়ান সংখ্যাগুলো লেখার জন্য প্রতিটিতে যতটি কোণ রয়েছে, সংখ্যাটিকে তত বলা হয়েছে। যেমন – ১ সংখ্যায় একটি কোণ রয়েছে, ২ সংখ্যায় দুটি কোণ রয়েছে, ৩ সংখ্যা তিনটি কোণ রয়েছে, ... ইত্যাদি। উপরের চিত্রটি দেখলেই ব্যাপারটি বোঝা যাবে। চিত্রে ° দিয়ে কোণগুলো বোঝানো হয়েছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে শূন্যের কোনো কোণ নেই!

রহস্যময় সংখ্যা

সংখ্যা নিয়ে অনেক রহস্যময় ঘটনাই ঘটেছে ভিন্ন ভিন্ন সময়।
একটা সংখ্যার কথাই ধরি। সংখ্যাটি হলো ১৪২৮৫৭। রহস্যময় সংখ্যা হিসেবে বিশেষ পরিচিত। এই সংখ্যাটিকে বিভিন্ন একক সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে একই ফল পাওয়া যায়। যেমন–

১৪২৮৫৭ × ২ = ২৮৫৭১৪
১৪২৮৫৭ × ৩ = ৪২৮৫৭১
১৪২৮৫৭ × ৪ = ৫৭১৪২৮
১৪২৮৫৭ × ৫ = ৭১৪২৮৫
১৪২৮৫৭ × ৬ = ৮৫৭১৪২

কিন্তু সংখ্যাটিকে যদি ৭ দিয়ে গুণ করা যায়, তবে এর ফলাফল একেবারেই অন্যরকম হয়ে যায়।

১৪২৮৫৭ × ৭ = ৯৯৯৯৯৯

আজব, তা-ই না?

প্রথম ব্যবহারযোগ্য কম্পিউটার

বিশ্বের প্রথম ব্যবহারযোগ্য কম্পিউটার হিসেবে বিবেচনা করা হয় যে কম্পিউারটিকে, তার নাম মার্ক ১ (Mark I)।

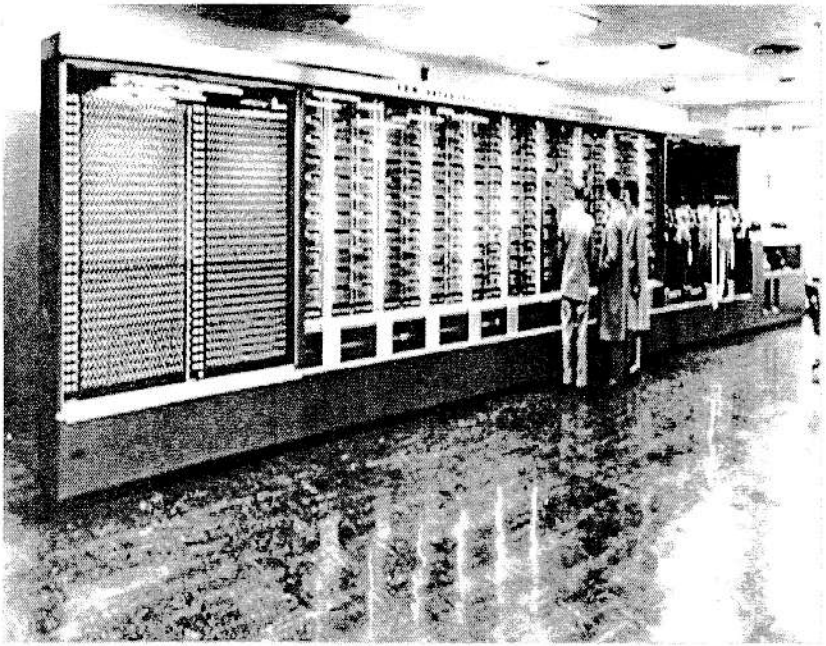

মার্ক ১ কম্পিউটার

১৯৪১ সালে হাওয়ার্ড আইকেন (Howard Eiken) নামে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞানী এই কম্পিউটারের ধারণা দেন। কিন্তু তিনি এই কম্পিউটার তৈরি করতে পারেননি। হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল প্রকৌশলী নিউইয়র্কের এন্ডিকোটে বৃহদাকার এই কম্পিউটারটি তৈরি করেন। কোনো মানুষের সহায়তা ছাড়াই এটি বিদ্যুতের সাহায্যে পরিচালনা করা যেতো। এই কম্পিউটারটির বৈশিষ্ট্য ছিলো–

ব্যবহৃত যন্ত্রাংশের সংখ্যা	:	৭,৬৫,০০০টি
ব্যবহৃত তারের পরিমাণ	:	৮০০ কিলোমিটার (৫০০ মাইল)
কম্পিউটারের দৈর্ঘ্য	:	১৬ মিটার (৫১ ফুট)
কম্পিউটারের উচ্চতা	:	২.৪ মিটার (৮ ফুট)

কম্পিউটারের ওজন	:	৪,৫০০ কিলোগ্রাম (১০,০০০ পাউন্ড)
গণনা পরিচালিত হতো	:	যান্ত্রিকভাবে, প্রায় ১৫.৫ মিটার (৫০ ফুট) শ্যাফট দিয়ে
পরিচালনায় বিদ্যুতের উৎস	:	৫ অশ্বশক্তি (৪ কিলোওয়াট) সম্পন্ন
আভ্যন্তরীণ সংযোগ সংখ্যা	:	৩০ লক্ষ
মাল্টিপোল রিলে সংখ্যা	:	৩,৫০০টি
রিলে সংযোজক সংখ্যা	:	৩৫,০০০
কাউন্টার সংখ্যা	:	দুটি
বাসায় টেনপোল স্যুইচ সংখ্যা	:	১,৪৬৪টি
গতি	:	যথেষ্ট ধীর
উষ্ণতা	:	অনেক বেশি

মার্ক ১ প্রতি সেকেন্ডে এটি তিনটি যোগ এবং একটি বিয়োগ করতে পারত। একটি গুণ অংক করার জন্য এটি এক সেকেন্ড সময় নিতে। এটি বিশ্বের সর্বপ্রথম কম্পিউটার নামে স্বীকৃতি লাভ করে। একে অটোমেটিক সিকোয়েন্স কন্ট্রোলড কম্পিউটার (Automatic Sequence Controlled Computer)ও বলা হতো।

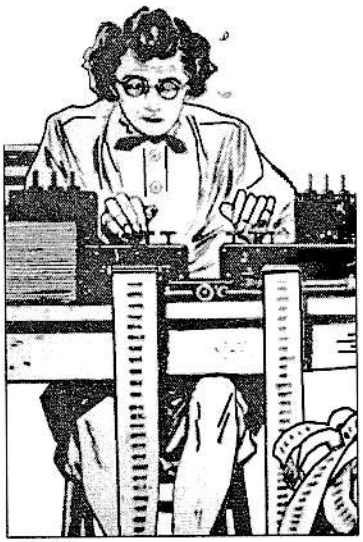

মার্ক ১ কম্পিউটারে বসে কাজ করছেন একজন গবেষক

সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, মার্ক ১ কম্পিউটারের উপরের অংশে একটি লম্বাটে ধরনের জলের আধার ছিলো, যার ভেতর দিয়ে অনবরত জল প্রবাহিত করা হতো। চালু অবস্থায় কম্পিউটারটিকে শীতল রাখার জন্য এটি একান্তভাবেই প্রয়োজন ছিলো।

কিউবিট

কিউবিটকে (Cubit) কোবিড (Covid)ও বলে। ধারণা করা হয়, আজ থেকে প্রায় ৩০০০ বছর আগে মিশরে রৈখিক পরিমাপের একক এই একক ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে প্রাচীন পৃথিবীর সর্বত্রই এই একক সমভাবে চালু হয়। কিউবিট প্রকৃত পক্ষে ১৮ ইঞ্চি বা ৪৫৭ মিলিমিটারের সমান। হাতের কনুই থেকে শুরু করে মধ্যমা আঙুলের শীর্ষ পর্যন্ত পরিমাপকে এক কিউবিট পরিমাপ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। অবশ্য পরবর্তীকালে কোনো কোনো এলাকায় এক কিউবিটকে ২১ ইঞ্চি বা ৫৩১ মিলিমিটার হিসেবে পরিমাপ করা হতো।

প্রাচীনকালের মানুষ পরিমাপের জন্য বিভিন্ন পরিমাপ ব্যবহার করলেও মিশরীয় এই এককটি রৈখিক পরিমাপের ক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে সর্বত্র ব্যবহৃত হতো। কালো গ্রানাইটে কালো রঙের তৈরি একটি রাজকীয় মাস্টার কিউবিটকে আর্দশ ধরে অন্যান্য কিউবিট তৈরি করা হতো। অবশ্য মাঝে মাঝে এই মাস্টার কিউবিটের সাথে অন্যান্য কিউবিটের তুলনা করে সেগুলোর মান যাচাই করা হতো।

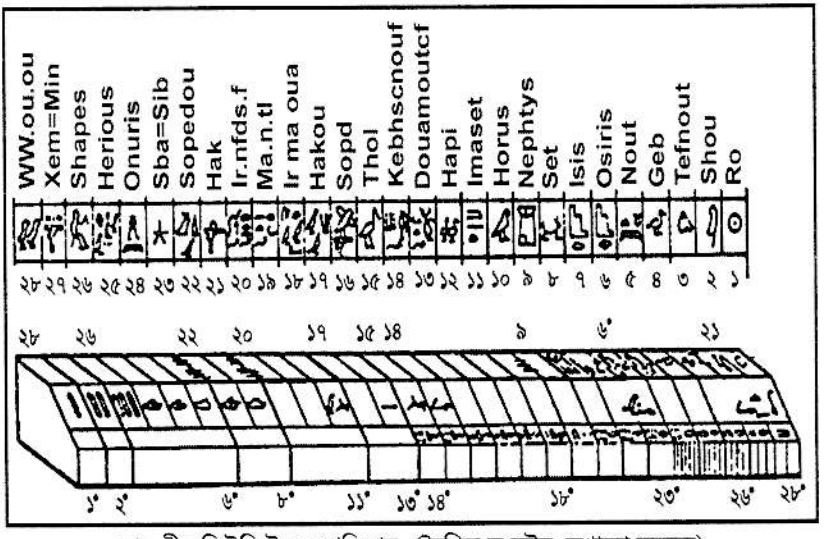

রাজকীয় কিউবিটের অংশবিশেষ (রৈখিক সংঘটন দেখানো হয়েছে)

রাজকীয় কিউবিট একটি অসাধারণ জটিল ধরনের যন্ত্র। এর পরিমাপ ছিলো ২০.৬২ ইঞ্চি বা ৫২৪ মিলিমিটার। এর মৌলিক উপএকক ছিলো আঙুল।

নিশ্চিতভাবেই এই সংখ্যা ছিলো আঙুলের প্রশস্ততা, রাজকীয় কিউবিটে ছিলো ২৮টি।

- চার আঙুল তালুর সমান, পাঁচ আঙুলে এক হাতের সমান।
- বারো আঙুলে বা তিন তালুতে একটি ছোট বিঘতের (span =হাতের তালুর প্রসারিত অবস্থায় বৃদ্ধাঙুলের মাথা থেকে কড়ে আঙুলের মাথার দূরত্ব) সমান।
- চৌদ্দ আঙুলে বা অর্ধ কিউবিট একটি বড় বিঘতের সমান।
- ষোল আঙুলে বা চার তালু সমান এক ছের (t'ser) মাপ।
- চব্বিশ আঙুলে বা ছয় তালুতে একটি ছোট কিউবিট হয়।

রাইন্ড প্যাপিরাস

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১,৭০০ অব্দ এসময় রাইন্ড প্যাপিরাস (Rhind Papyrus) লিখিত হয়। একে অ্যাহোমস্ প্যাপিরাসও (A'h-mosè Papyrus) বলা হয়।

রাইন্ড প্যাপিরাস (Rhind Papyrus) প্রাচীন মিশরীয়দের গাণিতিক বৈশিষ্ট্যের একটি চমকপ্রদ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত। এটি প্রণয়ন করেছেন অ্যাহমস (Ahmes)। ধারণা করা হয়, তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আনুমানিক ১৬৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এবং মারা যান আনুমানিক ১৬২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। প্রাচীন মিশরীয় গণিতে তিনি এক দিকপাল ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। রাইন্ড প্যাপিরাসে তিনি মিশরীয় গণিতের উৎকর্ষের কথা বর্ণনা করেছেন।

রাইন্ড প্যাপিরাস

এই প্যাপিরাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য মিশরীয় গণিতে নানা ধরনের কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছিল। পর পর দ্বিগুণত্ব এবং পর পর অর্ধ্বত্বের উপর ভিত্তি করেই নামতার বিন্যাস করা হয়।

মনে করা যাক, ৪১ কে ৫৯ দিয়ে গুণ করতে হবে। কিভাবে এই গুণ করা যাবে?

গুণ করার জন্য প্রথমেই ৫৯ সংখ্যাটি নেওয়া যাক। এবার এই ৫৯ সংখ্যার সাথে পুনরায় একই সংখ্যা যোগ করতে হবে। যে ফল পাওয়া যাবে, তাকে আবার সেই ফলের সাথে যোগ করতে হবে। এভাবে এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে। দেখা যাক, কি পাওয়া যায়–

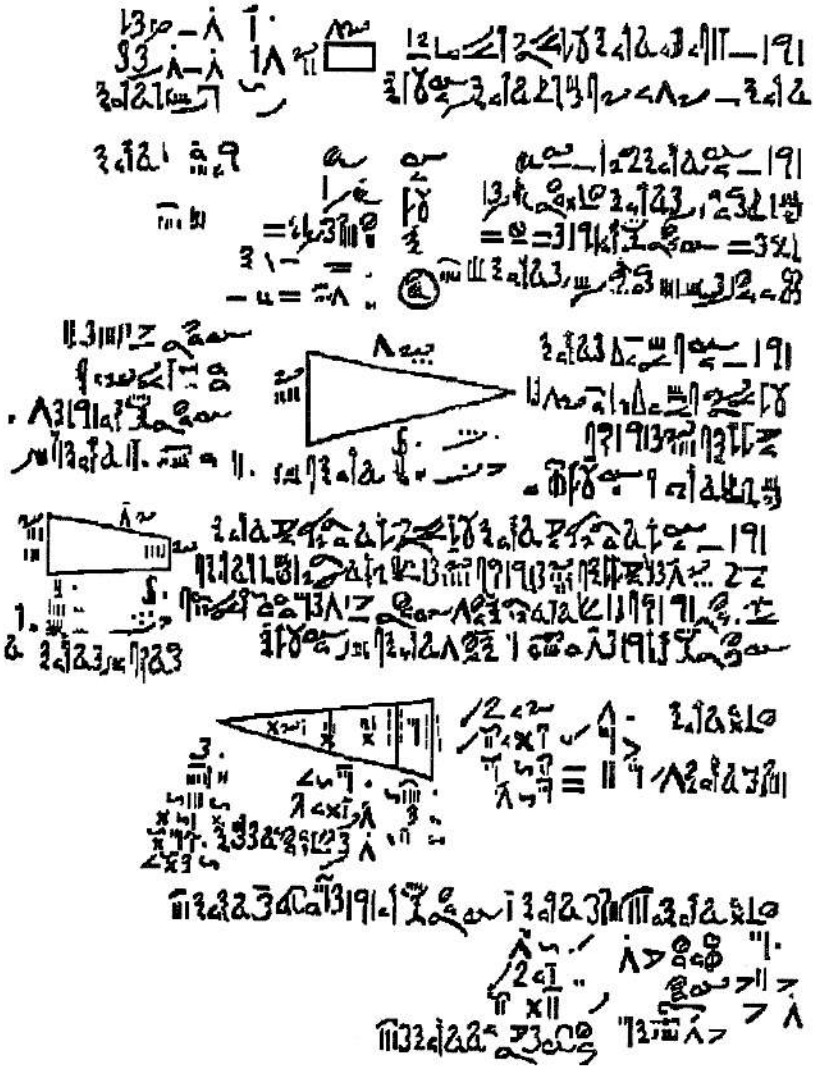

রাইন্ড প্যাপিরাস

৪১	৫৯
১	৫৯
২	১১৮
৪	২৩৬
৮	৪৭২
১৬	৯৪৪
৩২	১৮৮৮

যেহেতু ৬৪ সংখ্যাটি ৪১ সংখ্যার চেয়ে বড়ো, অর্থাৎ ৬৪ > ৪১, সেহেতু ৩২ সংখ্যার বেশি সংখ্যা পর্যন্ত যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

এবার কিছু বিয়োগের কাজ করা যাক–

৪১ - ৩২ = ৯, ৯ - ৮ = ১, ১ - ১ = ০

এখনে পাওয়া গেল, ৪১ = ৩২ + ৮ + ১

এবার উপরের সারণি ডানদিকের কলাম বা সারির সংখ্যাগুলো দেখা যাক। এখানে ৩২, ৮, ১ সংখ্যার বিপরীতে যে সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে সেগুলো নির্বাচন করা যাক। নির্বাচিত সংখ্যাগুলো যোগ করা যাক। যোগফল হিসেবে পাওয়া গেল ২৪১৯–

৪১	৫৯
১	৫৯√
২	১১৮
৪	২৩৬
৮	৪৭২√
১৬	৯৪৪
৩২	১৮৮৮√
	২৪১৯

এই ২৪১৯ সংখ্যাটিই হলো ৪১ এবং ৫৯–এর গুণফল।

উল্লেখ্য, এই গুণণ কাজটি করা হলো স্রেফ যোগ করার মাধ্যমে ! একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এটি বাইনারি গণিতের প্রাচীনতম ব্যবহারগুলোর অন্যতম। এখন যদি গুণণ কাজটি উল্টোভাবে করা যায়, অর্থাৎ ৫৯ কে যদি ৪১ দিয়ে গুণ করা হয়। তবে কি দাঁড়াবে–

৫৯	৪১
১	৪১√
২	৮২√
৪	১৬৪
৮	৩২৮√
১৬	৬৫৬
৩২	১৩১২√
	২৪১৯

এখন এই ৩২, ৮, ২, ১ সংখ্যাটির যোগফল থেকেই পাওয়া যাবে এই দুটি সংখ্যার গুণফল, অর্থাৎ ২৪১৯।

এভাবে সংখ্যা নিয়ে কাজ করার জন্য প্রতিটি সংখ্যার ভিত্তি জানা প্রয়োজন। মিশরীয়রা এসব ভিত্তির কোনো প্রমাণ লিখে যায়নি। এমনকি এর কোনো প্রয়োজন আছে বলেও তারা মনে করত না। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকে তারা ধরে নিয়েছিল যে, এগুলোর মান এমনটাই হবে। তবে এর ভিত্তি হিসেবে ২ ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। তাই ৪১ এবং ৫৯ কে লেখা যায় –

$৪১ = ১.২^{০} + ০.২^{১} + ০.২^{২} + ১.২^{৩} + ০.২^{৪} + ১.২^{৫}$ এবং

$৫৯ = ১.২^{০} + ১.২^{১} + ০.২^{২} + ১.২^{৩} + ১.২^{৪} + ১.২^{৫}$।

ভাগ বা বিভাজনের ক্ষেত্রেও দ্বিগুণত্বের ব্যবহার দেখা যায়। ধরা যাক, ১৪৯৫ সংখ্যাটিকে ৬৫ দিয়ে ভাগ করতে হবে। এই কাজটি করার জন্য নিচের মতো ধারাবাহিকভাবে এগোনো যাক–

১	৬৫
২	১৩০
৪	২৬০
৮	৫২০
১৬	১০৪০

এর চেয়ে বেশি আর এগোনোর প্রয়োজন নেই। কারণ পরবর্তী দ্বিগুণত্ব ১৪৯৫–এর চেয়ে বেশি। এবার উপরের ছকের ডানদিকের ঘরের সংখ্যাগুলোর যে কয়টি যোগ করলে ১৪৯৫ হয়, সেগুলো বের করে নেওয়া যাক। ছকে সেগুলো চিহ্নিত করে নেয়া যাক। পাওয়া গেল–

১	৬৫√
২	১৩০√
৪	২৬০√
৮	৫২০
১৬	১০৪০√

যেসব সংখ্যা পাওয়া গেল, তা হলো– ১০৪০ + ২৬০ + ১৩০ + ৬৫ = ১৪৯৫। এখন এসব সংখ্যার বামদিকের ঘরের সংখ্যাগুলো যোগ করা যাক। পাওয়া গেল–

১৬, ৪, ২ এবং ১

এখন এই সংখ্যাগুলো একসাথে যোগ করলেই উদ্দিষ্ট ফলাফল পাওয়া যাবে–

১৬ + ৪ + ২ + ১ = ২৩

এই সংখ্যাটিই হলো ১৪৯৫কে ২৩ দিয়ে ভাগ করার পর প্রাপ্ত উত্তর।

এখন ১৫০০ সংখ্যাটিকে যদি ৬৫ দিয়ে ভাগ করা হয়, তবে উত্তর দাঁড়াবে ২৩ এবং হাতে থাকে $\frac{৫}{৬৫}$ বা $\frac{১}{১৩}$। সুতরাং এক্ষেত্রে উত্তর হবে ২৩ $\frac{১}{১৩}$।

গুণ করো তো দেখি

একটা গুণ করি।

১২৩৪৫৬৭৯ কে ৯৯৯৯৯৯৯৯ দিয়ে গুণ করা যাক। দেখো তো কি হয়।

									১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৯
								দ্ধ	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯
								১	১	১	১	১	১	১	১	১
							১	১	১	১	১	১	১	১	১	
						১	১	১	১	১	১	১	১	১		
					১	১	১	১	১	১	১	১	১			
				১	১	১	১	১	১	১	১	১				
			১	১	১	১	১	১	১	১	১					
		১	১	১	১	১	১	১	১	১						
	১	১	১	১	১	১	১	১	১							
১	১	১	১	১	১	১	১	১								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১

মজার, তাই না?

ক্যালকুলেটর

ক্যালকুলেটর আধুনিককালের একটি অপরিহার্য গণক যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া বর্তমানকালে কোনো কাজই করা যায় না।

নানা ধরনের এবং নানা বৈশিষ্ট্যের ক্যালকুলেটর এখন যেখানে সেখানেই পাওয়া যায়। এদের গুণাগুণও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের।

ক্যালকুলেটর

জানো, এই ক্যালকুলেটর শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ইংরেজি শব্দ calculate থেকে। আর এই calculate শব্দটির উৎপত্তি হয়ে হিব্রু শব্দ calculi (ক্যালকুলি) থেকে।

ক্যালকুলি শব্দের অর্থ 'নুড়ি পাথর।"

মিটার এলো কোত্থেকে

প্রাচীনকালে বিভিন্নভাবে পরিমাপের কাজ করা হতো। বিভিন্ন দেশ তাদের নিজস্ব বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী এসব পরিমাপের কাজ করত। এই পরিমাপকে ইম্পেরিয়াল বা সাম্রাজ্যিক পরিমাপ বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বুড়ো আঙুলের প্রস্থের মাপকে ধরা হতো এক ইঞ্চি।

রাজা এডগারের নাকের ডগা থেকে তাঁর প্রশস্ত হাতের মধ্যাঙ্গুলের দূরত্ব ছিল এক গজ। এক জোড়া ষাঁড় একদিনে যতটুকু জমি লাঙ্গল দিয়ে চাষ করতে পারত, তাকে এক একর বলা হতো।

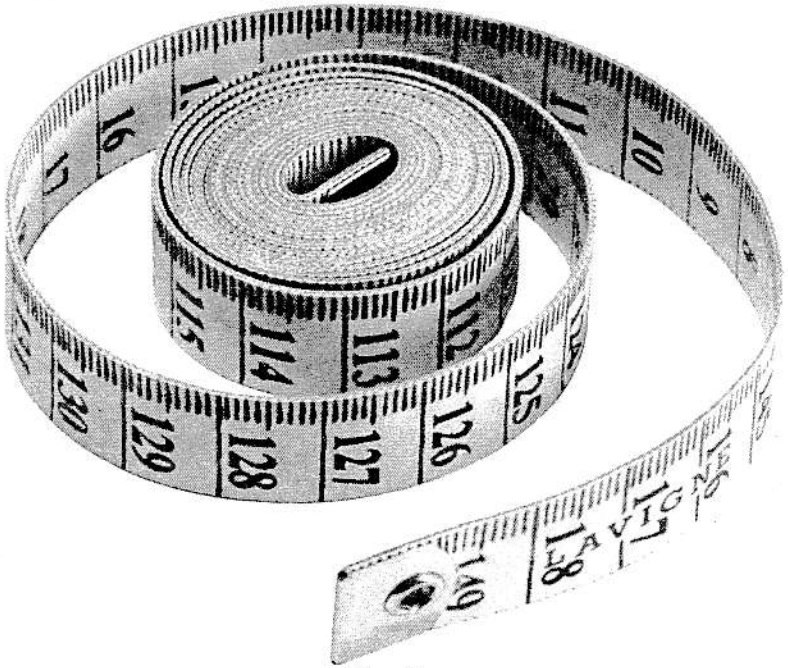

মিটার ফিতে

'মাইল' এককটি ব্যবহৃত হতে শুরু করে রোমের সেনাবাহিনীর পদক্ষেপের উপর নির্ভর করে। তারা মিলি (milli) বলতে ১০০টি পদক্ষেপের সমান দূরত্ব বা ১,৬১৮ গজ পরিমাণ দূরত্ব বোঝাত। কিন্তু সেনাবাহিনীর বিভিন্ন জনের পদক্ষেপে গরমিল থাকার কারণে পরবর্তীকালে গড় হিসাবে ১,৭৬০ গজকে এক মাইল হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।

দেখা যাচ্ছে, সাম্রাজ্যিক পরিমাপে গরমিল থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকতো। ফলে নতুন ও আরো অনেক মানসম্মত পরিমাপ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য ফ্রান্সের জাতীয় সংসদ ফ্রান্সের একাডেমি অব সায়েন্সকে নির্দেশ ও দায়িত্ব দেয়। এই দায়িত্ব পেয়ে একাডেমী কাজ শুরু করে। একাডেমির বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর মধ্যরেখা থেকে উত্তর মেরুর দৈর্ঘ্যের এক কোটির ভাগের এক ভাগকে দৈর্ঘ্যের আদর্শ মাপ হিসেবে বিবেচনা করে। এই পরিমাপকেই নাম দেওয়া হয় 'মিটার'। ১৭৯১ সালে কমিটি এই প্রস্তাব সংসদে জমা দেয় এবং ১৭৯৫ সালে এই একক সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়।

আধুনিককালের সংজ্ঞায় আলো কোনো শূন্যস্থানের ভেতর দিয়ে এক সেকেন্ডের ১/২৯৯ ৭৯২ ৪৫৮ সময়ে যে পথ অভিক্রম করে, তা-ই এক মিটারের সমপরিমাণ দূরত্ব!

২ এর সমান ১

মজা করতে কার না ভালো লাগে। আর মজাটা যদি হয় অংকের মতো জটিল ব্যাপার নিয়ে, তবে তো কথাই নেই। মজা করতে হলে চুপটি করে বসো। হ্যাঁ, এবার আসল কাজ শুরু করা যাক। মনে কর, তোমার কাছে 'ক' আর 'খ' দুটো রাশি আছে। 'ক' রাশিটি 'খ' রাশির সমান। অর্থাৎ

ক = খ ..... (১)

তবে মনে রাখতে হবে, 'ক' কিংবা 'খ' রাশির কেই-ই শূন্যের সমান নয়। অর্থাৎ

ক ≠ খ ..... (২)

এবার (১) নং সমীকরণের উভয়দিককে 'ক' দিয়ে গুণ করো। পাওয়া যাবে–

$ক^২$ = কখ ..... (৩)

আরও একটা কাজ কর। সমীকরণ (৩)-এর উভয় দিক থেকে $খ^২$ বাদ দিয়ে দাও। এখন পাওয়া গেল–

$ক^২ - খ^২$ = কখ - $খ^২$..... (৪)

বীজগণিতের সাধারণ সূত্র প্রয়োগ করে (৪) নং সমীকরণকে লেখা যায়–

(ক+খ) (ক-খ) = খ(ক-খ) ..... (৫)

এবার (৫) নং সমীকরণের উভয় দিককে (ক - খ) দিয়ে ভাগ কর–

$\frac{(ক+খ)(ক-খ)}{(ক-খ)} = \frac{খ(ক-খ)}{(ক-খ)}$ পাওয়া গেল–

ক + খ = খ ..... (৬)

আমরা তো আগেই ধরে নিয়েছি, 'ক' আর 'খ'–এর মান সমান। যদি তাই হয়, তবে (৬) নং সমীকরণে 'ক' এর পরিবর্তে 'খ' বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কি বলো? এখন কি পাওয়া গেল–

খ + খ = খ ..... (৭)

অথবা, ২খ = খ

এবার উভয় দিক থেকে 'খ' তুলে দাও। কি পেলে?

২ = ১

মজার কাণ্ড, তাই না!

পিথাগোরাসের উপপাদ্য রহস্য

কোনো সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের বর্গ অন্য দুই বাহুর বর্গের সমষ্টির সমান। মনে করা যাক, ABC একটি সমকোণী ত্রিভুজ। এর $AB^2 = AC^2 + BC^2$। এখানে C কোণটি সমকোণ এবং AB অতিভুজ। সাধারণভাবে একে $x^2 + y^2 = z^2$ আকারেও লেখা যায়। এটি একটি উপপাদ্য।

সামোয়াবাসী পিথাগোরাস

এই উপপাদ্যটি দীর্ঘদিন ধরেই পিথাগোরাসের উপপাদ্য (Pythagorian Theorem) হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রাচীন গ্রিক গণিতবিদ ও দার্শনিক পিথাগোরাসের (Pythagoras) জন্ম ৫৮২ খ্রিস্টপূর্বে।

কিন্তু পিথাগোরাসের এই উপপাদ্যটি তাঁর নিজের আবিষ্কৃত কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেছে। কারণ ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় বা তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিশ্বের আরো অনেক দেশেই পিথাগোরাসের জন্মেরও আগে থেকেই এই উপপাদ্যটি প্রচলিত ছিলো।

এখানে পিথাগোরাসের আগেই এ বিষয়ে প্রাচীনকালে গণিতবিদরা কি ধারণা করেছিলেন, তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো–

১৮০০ খ্রিস্টপূর্বের এক ব্যাবিলনীয় ট্যাবলেট থেকে জানা যায় যে, এই নিয়মটি বহু পূর্ব থেকেই ইরাকে প্রচলিত ছিল। সময়টা পিথাগোরাসের জন্মেরও প্রায় ১০০০ বছর আগে।

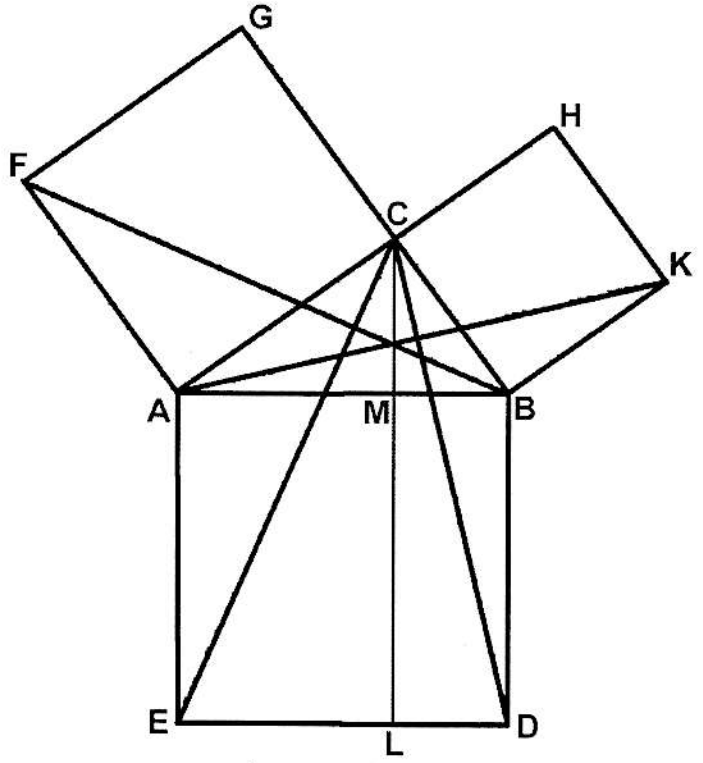

পিথাগোরাসের উপপাদ্য

প্রাচীন ভারতীয় লেখাতেও এই নিয়ম সম্পর্কে তথ্য রয়েছে বলে জানা যায়। বিশেষত ১০০ থেকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বে রচিত বিভিন্ন সূত্রে এই নিয়ম বিধৃত রয়েছে।

প্রাচীন চীনা রচনায় দেখা যায়, পিথাগোরাসের উপপাদ্যের কাছাকাছি নিয়ম সে দেশের বিজ্ঞানীরা বহু বছর আগে থেকেই ব্যবহার করে আসছে। সময়টা পিথাগোরাসের জন্মের পূর্বে না হলেও পিথাগোরাসের সমকালীন তো বটেই।

গণিতের রহস্য

গণিতের রহস্য অনেক। বলতে গেলে গণিত নিজেই এক মজা, এক মহাবিস্ময়!

এখানে এমনই এক মজার কথা বলছি তোমাদের...

দেখোই না একবার...

৬৫৩৫৯৪৭৭১২৪১৮৩	× ১৭ × ১ =	১১১১১১১১১১১১১১১১
৬৫৩৫৯৪৭৭১২৪১৮৩	× ১৭ × ২ =	২২২২২২২২২২২২২২২২
৬৫৩৫৯৪৭৭১২৪১৮৩	× ১৭ × ৩ =	৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩
৬৫৩৫৯৪৭৭১২৪১৮৩	× ১৭ × ৪ =	৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪
৬৫৩৫৯৪৭৭১২৪১৮৩	× ১৭ × ৫ =	৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫
৬৫৩৫৯৪৭৭১২৪১৮৩	× ১৭ × ৬ =	৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬
৬৫৩৫৯৪৭৭১২৪১৮৩	× ১৭ × ৭ =	৭৭৭৭৭৭৭৭৭৭৭৭৭৭৭৭
৬৫৩৫৯৪৭৭১২৪১৮৩	× ১৭ × ৮ =	৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮
৬৫৩৫৯৪৭৭১২৪১৮৩	× ১৭ × ৯ =	৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯

কোরিয়ান গণন দণ্ড

দীর্ঘদিন ধরেই গণিত জগতে এটি কোরিয়ান গণন দণ্ড (Korean computing rod) হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেছে।

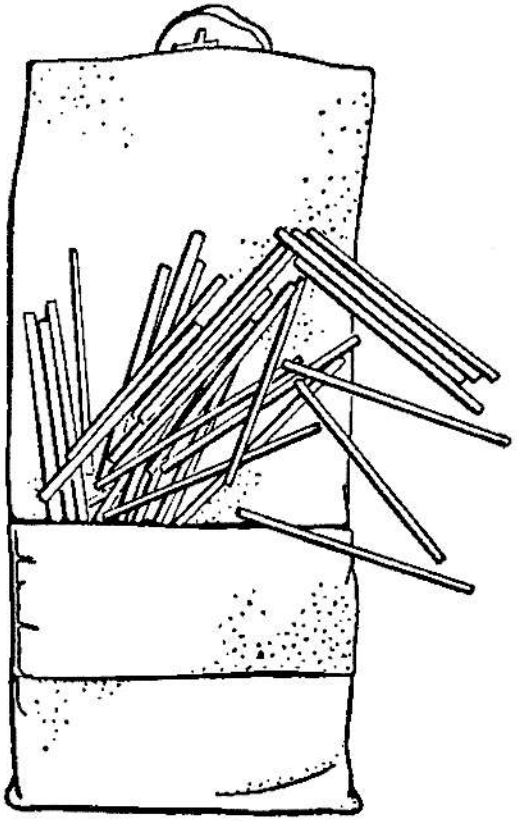

কোরিয়ান দণ্ড

এটি প্রকৃতপক্ষে চীনের প্রাচীন আমলে যে ধরনের অ্যাবাকাস ব্যবহার করা হতো, অনেকটা তার মতো। এটি মূলত বাঁশের তৈরি ছোট আকারের কিছু দণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব বাঁশের তৈরি দণ্ড অ্যাবাকাস বা অন্যান্য ধরনের প্রচলিত গাণিতিক যন্ত্রের পরিবর্তে ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীকালে এই দণ্ড চীন থেকে কোরিয়া স্থানান্তরিত হয় এবং এর পর থেকেই এগুলো কোরিয়ান গণন যন্ত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

ধারণা করা হয়, কোরিয়ান গণন দণ্ড খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে চীনে তৈরি হয় এবং সেখানেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। সাধারণ মানের গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কোরিয়ান গণন যন্ত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতো। কোরিয়ায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর এই গণন দণ্ডগুলো ১৯ শতকের প্রায় শেষ ভাগ পর্যন্ত চালু থাকে।

বাঁশ ছাড়াও এই গণন দণ্ডগুলো অনেক সময় বিভিন্ন বড়ো আকারের প্রাণীর হাড় দিয়েও তৈরি করা হতো। এসব গণন দণ্ড কোরিয়ান বিভিন্ন স্কুলে গণনা করার উপাদান হিসেবে দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এখনও এই গণন দণ্ড কোরিয়ার ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবেই স্বীকৃত হয়ে আছে।

পাই–এর রহস্য

গণিত রাজ্যের এক রহস্যময় সংখ্যা হলো পাই (pi)। পাই–এর মান হলো ২২/৭ এর সমান। প্রতীক হিসেবে পাইকে নিম্নলিখিতভাবে লেখা হয়–

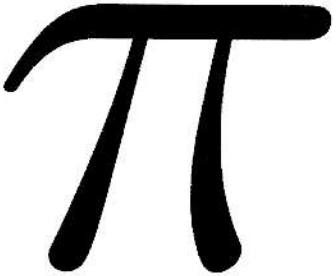

অন্যদিকে গাণিতিকভাবে লেখা যায়–

$$\pi = \frac{22}{7}$$

সাধারণভাবে এর মান লেখা হয় ৩.১৪।

বাইবেলে লেখা আছে, *এবং তিনি তৈরি করলেন একটি গলিত সাগর, যার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সীমানা হলো ১০ কিউবিটের মতো। এটি দেখতে প্রায় গোলাকৃতি এবং উচ্চতায় প্রায় ৫ কিউবিট এবং একে ঘিরে রাখা একটি রেখার পরিমাণ প্রায় ৩০ কিউবিটের মতো* (১ রাজা ৭:২৩)। বাইবেলের এই পয়ারটি উদ্ধৃত করা আছে খ্রিস্টপূর্ব ৯৫০ অব্দে প্রতিষ্ঠিত রাজা সলোমনের মন্দিরে।

ঐতিহাসিকভাবে প্রামাণ্য দলিলে দেখা যায়, ব্যাবিলনীয়রা কোনো বৃত্তের পরিমাপ করতেন বৃত্তটির ব্যাসার্ধের বর্গকে ৩ দিয়ে গুণন করে। একটি ব্যাবিলনীয় ট্যাবলেটে পাই-এর মান দেওয়া হয়েছিলো ৩.১২৫। এটি ১৯০০ থেকে ১৬৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে লেখা হয়েছিলো বলে ধারণা করা হয়।

প্রাচীনকালের মিশরীয়রা কোনো বৃত্তের পরিধি পরিমাপের জন্য একটি সূত্র ব্যবহার করতেন। সূত্রটি হলো–

$$[(8d)/9]^2$$

এখানে d হলো বৃত্তের ব্যাস। এই সূত্রের মাধ্যমে পাই–এর নির্ধারণ করা হয়েছে ৩.১৬০৫।

সাইরাকিউজের আর্কিমিডিস (Archimedes of Syracuse)। প্রাচীনকালের অন্যতম সেরা গণিতবিদ। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ২৮৭ খ্রিস্টপূর্বে এবং মারা যান ২১২ খ্রিস্টপূর্বে। একটি বৃত্তের মধ্যকার নিয়ত বহুভুজের আয়তনের সাথে সেই

বহুভূজটি অন্য যে বৃত্তের ভিতর রয়েছে, তার মানের তুলনা করে তিনি পাই–এর মান নির্ধারণ করতেন।

প্রাচীনকালের এসব গণিতবিদের কাজের মাধ্যমে পাই–এর মান নির্ধারিত হলেও পাইকে বোঝানোর জন্য কোনো প্রতীক নির্ধারিত ছিল না। ১৭০৬ সালে একজন ইংরেজ গণিতবিদ গ্রিক বর্ণ পাইওয়াসকে (Piwas) কে পাই–এর (π) প্রতীক হিসেবে ব্যবহারের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। এটি গ্রিক বর্ণমালার ১৬তম বর্ণ। তবে আরো পরে গণিতবিদ ইউলার (Euler) এই প্রতীকটিকে দাপ্তরিকভাবে গ্রহণ করেন।

১৮৯৭ সালের দিকে ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের আইনসভায় পাই–এর সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মানটিকে আইনসিদ্ধ করার জন্য একটি বিল উত্থাপন করা হয়। কিন্তু সেই বিলটি কখনই পাস করা হয়নি।

তবে দশমিকের পর ১০০ সংখ্যা পর্যন্ত পাই–এর মান ১৭০১ সালেই নির্ধারন করা হয়েছে বলে জানা যায়। এই মানটি নিচে দেওয়া হলো–

৩.১৪১৫৯২৬৫৩৫৮৯৭৯৩২৩৮৪৬২৬৪৩৩৮৩২৭৯৫০২৮৮৪১৯৭১৬৯৩ ৯৯৩৭৫১০৫৮২০৯৭৪৯৪৪৫৯২৩০৭৮১৬৪০৬২৮৬২০৮৯৯৮৬২৮০৩৪৮২৫ ৩৪২১১৭০৬৭৯

অধিকাংশ মানুষের ধারণা নেই যে, একটি বৃত্তে প্রকৃতপক্ষে অসীম সংখ্যক বাঁক (corner) থাকে। পাই–এর মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি বৃত্তের কতগুলো স্থানে একটি ব্যাস যুক্ত হতে পারে, সেই সংখ্যাটি গুরুত্বলাভ করে।

এখানে পাই–এর অন্য একটি রহস্য উন্মোচন করছি। উপরে উধৃত পাই–এর ১০০ দশমাংশ স্থান পর্যন্ত মান লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এর ৩১ সংখ্যা পর্যন্ত কোনো শূন্য নেই।

দশমিকের পর ১০০ সংখ্যা পর্যন্ত পাই–এর মান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো নানাভাবে এসেছে। নিচে এর একটি তালিকা দেওয়া হলো–

০ = ৮
১ = ৮
২ = ১২
৩ = ১১
৪ = ১০
৫ = ৮
৬ = ৯

৭ = ৮
৮ = ১২
৯ = ১৪

পাই সম্পর্কিত একটি মজার তথ্য হলো, পাই শুধু অলীক বা অযৌক্তিক (irrational) সংখ্যাই নয় এটি একটি অলৌকিক (transcendental) সংখ্যাও বটে।

১৯৩১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড-এর একজন ব্যবসায়ী ঘোষণা করেন যে, পাই-এর মান হবে ২৫৬/৮১।

আরো একটি মজার বিষয় হলো, পাই-এর মান যদি দশমিকের পর ১০ লক্ষ সংখ্যা পর্যন্ত লেখা যায়, তবে তা নিউইয়র্ক থেকে কানসাস পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়াসুমাসা কানাডা নামের একজন গণিতবিদ কম্পিউটারে দশমিকের পর ৬,৪৪২,৪৫০,০০০ সংখ্য পর্যন্ত পাই-এর মান নির্ধারণ করেন। এই কাজটি করার জন্য কম্পিউটারেই প্রায় ১১৬ ঘণ্টা সময় লেগেছিল।

১৭০৬ সালে জন ম্যাচিন পাই-এর মান নির্ধারণের জন্য দ্রুততম একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন। এটি হলো- $\pi/4 = 4 * \arctan(1/5) - \arctan(1/239)$।

১৯৪৯ সালে তৎকালীন সবচেয়ে উন্নত কম্পিউটার এনিয়াক (ENIAC) দিয়ে পাই-এর মান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়। এই কম্পিউটার দিয়ে দশমিকের পর ২০৩৭ সংখ্যা পর্যন্ত পাই-এর মান নির্ণয় করা হয়। এই কাজে কম্পিউটারটির প্রায় ৭০ ঘণ্টা সময় লেগেছিল।

জার্মান গণিতবিদ লুডলফ ভ্যান সিউলেন (Ludolph van Ceulen) দশমিকের পর ৩৫ সংখ্যা পর্যন্ত পাই-এর মান নির্ণয়ের জন্য তাঁর সারা জীবন ব্যয় করেন।

১৭৬৮ সালে যোহান ল্যামবার্ট (Johann Lambert) প্রমাণ করেন যে পাই-এর মান একটি অলীক বা অযৌক্তিক সংখ্যা (irrational number) এবং ১৮৮২ সালে ফার্ডিন্যান্দ লিন্ডেমান (Ferdinand Lindemann) প্রমাণ করেন যে এই মানটি আসলে একটি অলৌকিক সংখ্যা (transcendental number)।

মজার অঙ্ক

গণিতে সংখ্যা মাত্র ১০টি। ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯। এই সংখ্যা কয়টি দিয়েই চলছে সারা বিশ্বের সহজ থেকে জটিলতম গণিতটিও। এর বাইরে কিন্তু কিছু নেই।

এখন এই ১০টি সংখ্যার মধ্যে ০ (শূন্য) বাদ দিয়ে সংখ্যা থাকে মাত্র ৯টি। এই ৯টি সংখ্যাকে পাশাপাশি সাজালে পাওয়া যায়, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯। আর একসাথে লিখলে পাওয়া যায় ১২,৩৪,৫৬,৭৮৯ অর্থাৎ ১২ কোটি ৩৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭ শত ৮৯।

এই সংখ্যাগুলো প্রায়শই নতুন নতুন মজার মজার অঙ্ক তৈরি করা যায়। যেমন সংখ্যাগুলোর মাঝে যোগ (+) ও বিয়োগ (-) চিহ্ন বসিয়ে বসিয়ে ১০০ সংখ্যাটিকে প্রকাশ করা যায়।

১২ + ৩ − ৪ + ৫ + ৬৭ + ৮ + ৯ = ১০০
১২৩ + ৪ − ৫+ ৬৭ − ৮৯ = ১০০
১ + ২ + ৩৪ − ৫ + ৬৭ − ৮ + ৯ =১০০
১২ + ৩ − ৪ + ৫ + ৬৭ + ৮ + ৯ = ১০০
১২৩ + ৪ − ৫ + ৬৭ + ৮৯ =১০০
১২৩ + ৪৫ − ৬৭ + ৮ − ৯ = ১০০
১২৩ − ৪৫ −৬৭ + ৮৯ = ১০০
১২ − ৩ − ৪ + ৫ − ৬ + ৭ + ৮৯ = ১০০
১২ + ৩ + ৪ + ৫ − ৬ − ৭ + ৮৯ = ১০০
১ + ২৩ − ৪ + ৫ + ৬ + ৭৮ − ৯ = ১০০
১ + ২৩ − ৪ + ৫৬ + ৭ + ৮ + ৯ = ১০০
১ + ২ + ৩ + ৪ + ৫ + ৬ + ৭৮ + ৯ = ১০০
− ১ + ২ − ৩ + ৪ + ৫ + ৬ + ৭৮ + ৯ = ১০০
১ + ২.৩ − ৪ + ৫ + ৬.৭ + ৮৯ = ১০০
৯৮ − ৭৬ + ৫৪ + ৩ + ২১ = ১০০
৯ − ৮ + ৭৬ + ৫৪ − ৩২ + ১ = ১০০
৯৬ + ৭ + ৬ − ৫ − ৪ − ৩ + ২ − ১ = ১০০
৯৮ − ৭ − ৬ − ৫ − ৪ + ৩ + ২১ = ১০০
৯ − ৮ + ৭৬ − ৫ + ৪ + ৩ + ২১ = ১০০

৯৮ − ৭ + ৬ + ৫ + ৪ − ৩ − ১ = ১০০
৯৮ + ৭ − ৬ + ৫ − ৪ + ৩ − ২ − ১ = ১০০
৯৮ + ৭ − ৬ + ৫ − ৪ − ৩ + ২ + ১ = ১০০
৯৮ − ৭ + ৬ + ৫ − ৪ + ৩ − ২ + ১ = ১০০
৯৮ − ৭ + ৬ − ৫ + ৪ + ৩ + ২ − ১ = ১০০
৯৮ + ৭ − ৬ − ৫ + ৪ + ৩ − ২ − ১ = ১০০
৯৮ − ৭ − ৬ + ৫ + ৪ + ৩ + ২ + ১ = ১০০
৯ + ৮ + ৭৬ + ৫ + ৪ − ৩ + ২ − ১ = ১০০
৯ + ৮ + ৭৬ + ৫ − ৪ + ৩ + ২ + ১ = ১০০
৯ − ৮ + ৭ + ৬৫ − ৪ + ৩২ − ১ = ১০০
− ৯ + ৮ + ৭৬ +৫ − ৪ + ৩ + ২১ = ১০০
− ৯ + ৮ + ৭ +৬৫ − ৪ + ৩২ + ১ = ১০০
− ৯ − ৮ + ৭৬ − ৫ + ৪৩ + ২ + ১ = ১০০
৯ + ৮৭.৬ + ৫.৪ − ৩ + ২ − ১ = ১০০

মজার তাই, না?

টেবুলেটিং মেশিন

কম্পিউটারের বিবর্তনের ইতিহাসে হারম্যান হোলারিথ (Herman Hollerith) একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। তাঁকে বিশ্বের প্রথম পরিসাংখ্যিক প্রকৌশলী বা স্ট্যাটিসটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (Statistical Engineer) অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যায় ব্যাপক উঠানামা লক্ষ্য করা যায়। ধারণা করা হয় যে, ১৮৮০ সাল থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে সে দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ বেড়ে গেছে। এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় পর্যায়ের জনসংখ্যা যত না বেড়েছে তার চেয়ে বেশি বেড়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে আবাস গড়ার লক্ষ্যে আগত বহিরাগত মানুষের সংখ্যা। এর ফলে নগরায়ন ও পশ্চিমমুখী মানুষের ঢল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারি কর্তৃপক্ষকে বেশ ভাবিয়ে তোলে। স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার একটি পরিসংখ্যান গ্রহণের বিষয়টি মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আগের আদমশুমারির তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনার কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগেই পুরো প্রক্রিয়াটির ধীরগতি সামগ্রিক কার্যক্রমকেই স্থবির করে দেয়।

এই কাজ দ্রুততার সাথে করার জন্য কি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যায়, তা জানার জন্য আদমশুমারি কর্তৃপক্ষ একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন। এই আহ্বানে সাড়া দেন হারম্যান হোলারিথ। এবং স্বাভাবিকভাবেই প্রতিযোগিতায় জয়ী হন।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগিতায় হারম্যান হোলারিথের এই জয় যে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারিকে সহজসাধ্য ও স্বল্পতম সময়ের মধ্যে করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, তা-ই নয়, ভবিষ্যতে বিপুল আকারের কোনো তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যেতে পারে, তার ধারণাও মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়। এই কাজটি করার জন্য হারম্যান হোলারিথ একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠার আবেদন জানালে সেটিও অনুমোদিত হয়। আর এভাবেই হারম্যান হোলারিথের হাত ধরে বিশ্ব সংখ্যা গণনার এক নতুন অবস্থায় উপনীত হয়।হোলারিথ তাঁর প্রথম গণক যন্ত্রটি তৈরি করার সূত্র গ্রহণ করেন মেরি জ্যাকার্ড-এর পদ্ধতি থেকেই। তিনি পাঞ্চড কার্ড ব্যবহার করেন অনেকটা জ্যাকার্ডের মতোই, তবে এক্ষেত্রে তিনি ছোট ছোট কার্ড ব্যবহার না করে কাগজের লম্বা ফালি ব্যবহার করেন। এই কাগজের ফালির কোনো ছিদ্র দিয়ে তিনি হয়তো নারীকে বুঝিয়েছেন আবার কোনো ছিদ্র দিয়ে তিনি পুরুষ

মানুষ বুঝিয়েছেন। কাগজের কোনো ছিদ্র দিয়ে তিনি হয়তো দেশে জন্মগ্রহণকারী শিশুকে বুঝিয়েছেন আবার অন্য স্থানের ছিদ্র দিয়ে তিনি বিদেশে জন্মগ্রহণকারী শিশুকে বুঝিয়েছেন।

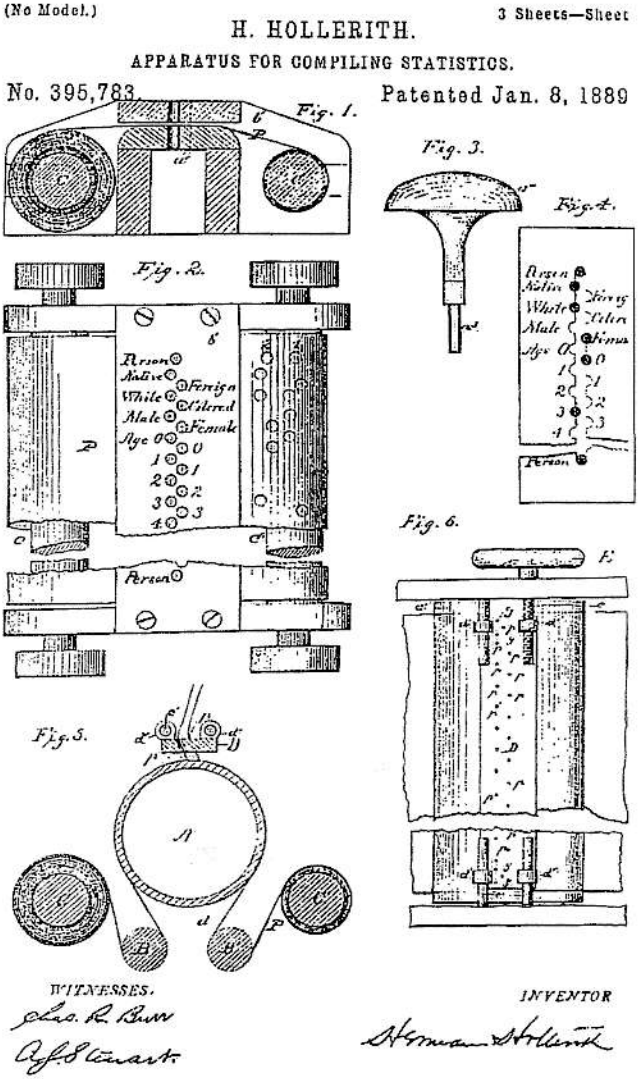

হারম্যান হোলারিথের টেবুলেটিং মেশিনের প্যাটেন্ট সংক্রান্ত কাগজ

পরবর্তীকালে হোলারিথ এসব ছিদ্র ভিন্নভাবে সজ্জিত করে নতুন ধারণার তথ্য সংযোজন পদ্ধতি তৈরি করেছিলেন। তিনি তাঁর যন্ত্রটির প্যাটেন্ট করানোর জন্য যে আবেদন করেছিলেন, তাতে তিনি উলেখ করেছিলেন যে, 'এই যন্ত্রের সাহায্যে একটি লম্বা কাগজের ফালিতে সুবিধামতো বিভিন্ন ছিদ্র করে কোনো মানুষের পরিসংখ্যান রেকর্ড করা যাবে।'

যখন কাগজের এই লম্বা ফালিটি কোনো গণক যন্ত্রে প্রবেশ করানো হবে, তখন এই কাগজের ফালিটি একটি বিদ্যুৎচালিত ড্রামের উপর দিয়ে যাবে। এই অবস্থায় কাগজে যদি কোনো ছিদ্র থাকে, তবেই সার্কিটটি পূর্ণ হবে। আর সার্কিটটি পূর্ণ হওয়া মাত্র একটি সংকেত হবে, যাবে বোঝা যাবে তথ্যটি আসলে কি ছিল।

টেবুলেটিং মেশিন

মূলত বিদ্যুতের ব্যবহারই হারম্যান হোলারিথের টেবুলেটিং মেশিনকে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দেশের আইন ও নীতিনির্ধারকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। এর ফলে যন্ত্রের গতি আর দক্ষতাই যে কেবল বেড়েছে তা নয়, এতে প্রাচীন আমলের হাতে চালানো গিয়ারযুক্ত মেশিনের স্বল্প দক্ষতা ও ধীরগতির লক্কর-জক্করমার্কা কার্যক্রমকেও এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

বিদ্যুতের ব্যবহার ছাড়াও হোলারিথের টেবুলেটিং মেশিনের অন্য যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তা হলো ছিদ্র করার মাধ্যমে তথ্য নিয়ে কাজ করা। এটি পরবর্তীকালে কম্পিউটার তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে। এই ছিদ্র করার প্রক্রিয়া মূলত আধুনিককালের বাইনারি পদ্ধতির শূন্য (০) এবং এক (১)–এর সমার্থক। হোলারিথের মেশিনের ছিদ্র আধুনিক বাইনারি পদ্ধতির এক (১)–এর সমার্থক এবং ছিদ্রহীনতা শূন্য (০)–এর সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

কিন্তু কাজের এক পর্যায়ে হোলারিথ লম্বাটে ফালির কাগজ দিয়ে কাজ করা আসলেই খুব কঠিন। কারণ কাগজের এই ফালির কোনো অংশে যদি ভাঁজ পড়ে, তবে তা পুরো কাগজের ফালিতেই সমস্যা সৃষ্টি করে। আর এক্ষেত্রে বার বার আগুপিছু করে সংশোধন করাও সম্ভব হয় না।

কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না কাগজের ফালিটিকে গণক যন্ত্রে প্রবেশ করানো হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাগজের ফালির ঠিক কোন স্থানে বা কোথায় কোন তথ্যে গিয়ে ভাঁজ পড়েছে তা বের করা এককথায় অসম্ভব। এ সমস্যার সমাধান হোলারিথের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য পরবর্তীকালে লম্বাটে ফালি কাগজের ব্যবহার থেকেই ম্যাগনেটিক টেপ স্টোরেজ ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করার ধারণাটি উদ্ভাবিত হয়েছে।

এখানে উলেখ্য, প্রথমদিককার কিছু কম্পিউটার এই ধরনের টেপ ব্যবহার করেই কাজ করতো। শুধু তা–ই বর্তমানকালেও বিশাল পরিমাণ তথ্য ধারণ করা বা সংগ্রহ করার জন্য লম্বা টেপ ব্যবহার করা হয়।

কম্পটোমিটার

প্রাত্যহিক দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করা যায় এমন ধরনের একটি যন্ত্র ১৮৮৭ সালের দিকে প্রথম বাজারজাত করে ফেল্ট এন্ড টরেন্ট ম্যানুফেকচারিং কোং (Felt & Tarrant Manufacturing Co.) নামের একটি প্রতিষ্ঠান। তাদের তৈরি এই যন্ত্রের নাম কম্পটোমিটার (Comptometer)।

এই যন্ত্রে টাইপরাইটাইরের মতো অনেকগুলো চাবি বা কী ছিলো। চাবিগুলো লম্বাটে সারিতে সাজানো থাকতো। প্রতি সারিতে ৯টি করে চাবি থাকতো। এভাবে ১০টি সারিতে সর্বমোট ৯০টি চাবি থাকতো। প্রতিটি চাবিতে একটি করে সংখ্যা বসানো ছিলো।

শুধু তা-ই নয়, গুরুত্ব বা বিষয় বোঝানোর জন্য বিভিন্ন স্তরের কী বা চাবিকে বিভিন্ন রং দিয়ে রঞ্জিত করা হতো। চাবিগুলোর পাশে একটি করে ছোট ছিদ্র ও পিনের মতো যুক্ত ছিলো। কাঠের তৈরি একটি বাক্সে এই কম্পটোমিটার বসানো থাকতো। পুরো যন্ত্রটির লম্বা অংশের এক পাশে একটি হাতলের মতো লাগানো ছিলো, যা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গণনার কাজ সম্পন্ন করা হতো।

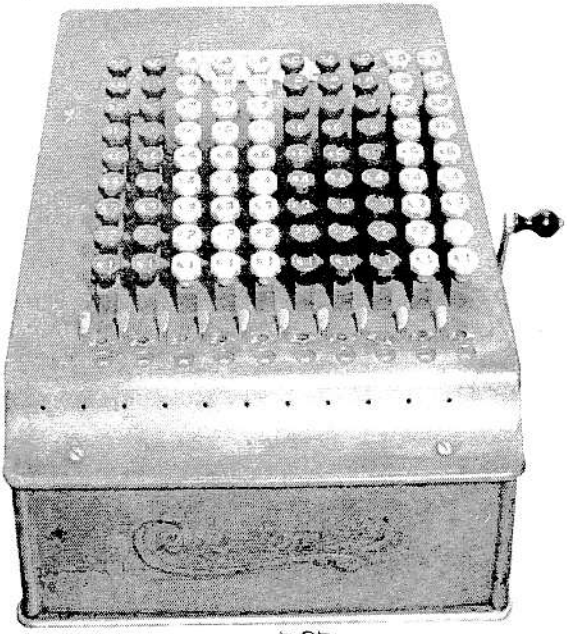

কম্পটোমিটার

এই কম্পটোমিটারে কোনো প্রিন্টার বা মুদ্রক ছিলো না। এটি কেবল গণনা করার কাজেই ব্যবহৃত হতো। গণণার ফলাফল অন্য কাগজে হাতে লিখে নেওয়া হতো। গণনার ফলাফল মুদ্রণ করা যেত না বলে গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত ক্ষোভ আসতে থাকে। ফলে একসময় এর গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পেতে থাকে।

গ্রাহকদের আগ্রহ ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে ১৮৮৯ সাল থেকে কোম্পানিটি নতুনভাবে মুদ্রকসহ নতুন একটি গণক যন্ত্র তৈরি করতে শুরু করে। যন্ত্রটির নাম দেওয়া হয় কম্পটোগ্রাফ (Comptograph)।

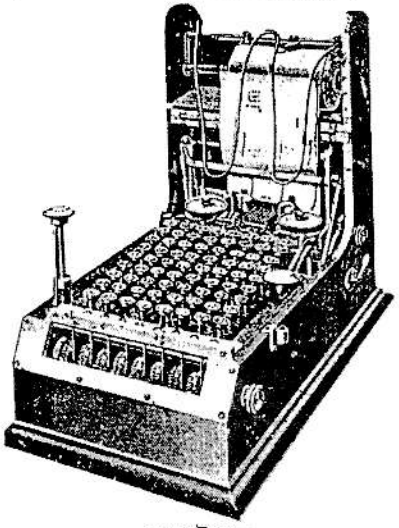

কম্পটোগ্রাফ

কম্পটোগ্রাফ প্রকৃতপক্ষে কম্পটোমিটারেরই একটি উন্নত রূপ। এতে গণক যন্ত্র ছাড়াও ফলাফল একটি দৃশ্যমান মুদ্রক যন্ত্র ছিল, যাতে খুব সহজেই গণনার ফলাফল মুদ্রিত আকারে পাওয়া যেত।

দীর্ঘদিন ধরেই এই যন্ত্রটি ব্যবহারকারীদের দৈনন্দিন কাজের চাহিদা পূরণ করে গেছে। অবশ্য অন্য অনেক যন্ত্রের মতোই এই যন্ত্রটিও এক পর্যায়ে ব্যবহারকারীদের অনাগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং এক পর্যায়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

অ্যাডভ্যাক কম্পিউটার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস এলামোস (Los Alamos)–এ আণবিক অস্ত্রের উন্নয়ন এবং পারমাণবিক শক্তি নিয়ে গবেষণা করছিলেন প্রখ্যাত গণিতবিদ জন ভন নিউম্যান (John von Neumann)। ১৯০৩ সালের ২৮শে ডিসেম্বর জার্মানির বুদাপেস্টে নিউম্যান জন্মগ্রহণ করেন। শুধু এই বিষয়গুলোই নয়, তাঁর গবেষণায় ছিল বিশ্বের সর্বপ্রথম কম্পিউটারটি তৈরি করার পরিকল্পনাও।

জন ভন নিউম্যান

যুদ্ধের পর পরই, নিউম্যান অস্ত্র এবং পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কিত গবেষণা থেকে নিজেকে অনেকটা গুটিয়ে নেন। আত্মনিয়োগ উন্নতমানের গণক যন্ত্র তৈরি করা প্রচেষ্টায়।

১৯৪৫ সালের দিকে তিনি একটি গণক যন্ত্রের পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন, যা থেকে পরবর্তীকালে তৈরি করা হয় অ্যাডভ্যাক (EDVAC) নামে কম্পিউটারটি। এর পুরো নাম হলো ইলেকট্রনিক ডিসক্রিয়েট ভ্যারিয়েবল অটোমেটিক কম্পিউটার (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)। এটি বিশ্বের প্রথম কম্পিউটারের বিবরণ, যাতে অভ্যন্তরীন প্রোগ্রাম ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। এই কম্পিউটারটি ভন নিউম্যান কম্পিউটার (von Neumann computer) নামেই পরিচিতি লাভ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুর স্কুল অব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (Moore School of Electrical Engineering)–এ অ্যাডভ্যাক যন্ত্রটি তৈরি করা হয়। ১৯৪৯ সালের দিকে এটি অ্যাবারডিনের বিআরএল কম্পিউটিং গবেষণাগারে (BRL Computing

Laboratory) সরবরাহ করা হয়। প্রাথমিকভাবে যন্ত্রটি চালানোর পরপরই এতে কিছু যুক্তিভিত্তিক ভ্রান্তি (logical errors) লক্ষ্য করা যায়।

পল নিউম্যান নিজেই এসব সমস্যা দূরীকরণের চেষ্টা চালান। প্রায় ১৮ মাস কাজের পর সমস্যাগুলো একেবারেই দূর হয়ে যন্ত্রটি কার্যকর হয়ে উঠে। ১৯৫১ সালের দিকে যন্ত্রটি দিয়ে সামান্য পরিমাণে কাজ শুরু করা হয়।

পরবর্তী বছরেই অর্থাৎ ১৯৫২ সালের দিকে এটি সপ্তাহে গড়ে ১৫ থেকে ২০ ঘণ্টা ধরে কাজ করতে থাকে। প্রাথমিকভাবে এই যন্ত্রটি দিয়ে জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হতো। ১৯৬১ সালের মধ্যে যন্ত্রটি প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১৪৫ ঘণ্টার মতো কাজ করতে পারতো।

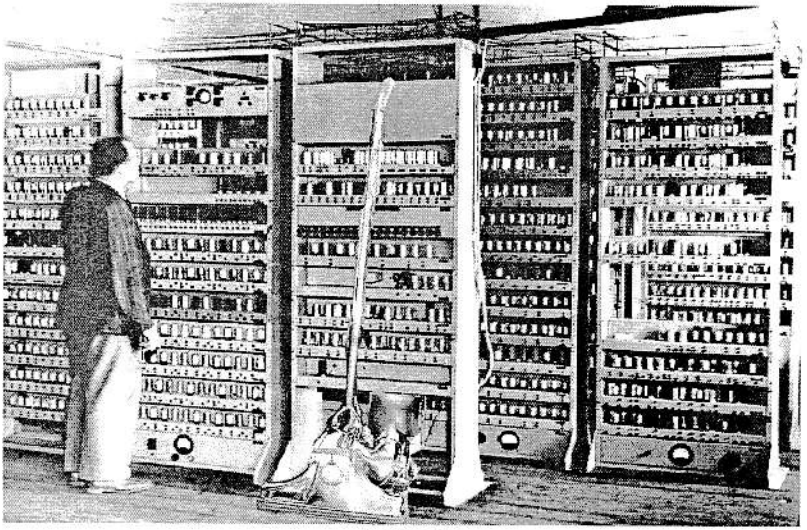

অ্যাডভ্যাক

অ্যাডভ্যাক হলো পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার যাতে প্রথমবারের মতো আভ্যন্তরীণভাবে সংরক্ষিত প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হতো। এর কয়েকটি ধাপ বা পর্যায় ছিলো–

নিয়ন্ত্রক অংশ (Control): এই অংশে কম্পিউটারটি পরিচালনার জন্য অপারেটিং বাটন, নির্দেশক বাতি, নিয়ন্ত্রণ সুইচ এবং একটি অসিলোস্কোপ (oscillascope) যুক্ত করা হয়েছিলো।

ডিসপ্যাচার (Dispatcher): এই অংশে নিয়ন্ত্রক অংশ ও স্মৃতি থেকে প্রাপ্ত নির্দেশাবলীর অর্থ বা সংকেত বের করার কাজে সহায়তা করতে সক্ষম।

উচ্চগতির স্মৃতি (High-Speed Memory): এই অংশে দুটি একই ধরনের একক ইউনিট ছিলো, প্রতিটিতে ৬৪–অকাস্টিক ডিলে লাইন (64 acoustic delay lines) যুক্ত ছিলো।

কম্পিউটার (Computer): এই অংশ প্রকৃতপক্ষে যুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন কাজ (যেমন যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি) করা হয়। এক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক মতবিভেদ থাকলেই যন্ত্রটি বন্ধ হয়ে যেতো।

টাইমার (Timer): এই টাইমারটি প্রতি ১ মাইক্রোসেকেন্ড পর পর এক ধরনের পালস দিয়ে যেতো।

এই যন্ত্রটি প্রায় ১০ বছর একটানা বিজ্ঞানী টানা সাহায্য করে গেছে। অ্যাডভাকের কর্মদক্ষতা ও প্রাযুক্তিক উৎকর্ষতার কারণে ধারণা করা হয়, এটি এখনও সমানভাবে কার্যকর। তাছাড়া এর চালনা করার স্বল্প ব্যয়, উঁচুমানের পরিচালনা পদ্ধতি, গতি এবং বিশেষ কিছু সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যন্ত্রটির দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে এর ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করা গেছে।

বিশ্বসেরা গণিতবিদ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই গণিতের নানা ধরনের বিবর্তন হয়েছে। গণিতশাস্ত্র নানা দেশেই ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। নিচে বিভিন্ন দেশের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় গণিতবিদের নাম উল্লেখ করা হলো–

ভারতবর্ষ

১. বোধিয়ানা (খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০ সাল)
২. অপস্তম্ভ (খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ সাল)
৩. কাত্যায়ন (খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ সাল)
৪. উমাস্বতী (খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ সাল)
৫. আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দ)
৬. বরাহমিত্র (৫০৫–৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৭. ব্রহ্মগুপ্ত (৫৯৮–৬৭০ খ্রিষ্টাব্দ)
৮. গোবিন্দস্বামী (৮০০–৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
৯. মহাবীর বা মহাবীরাচার্য (৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
১০. প্রুথুডাকস্বামী (৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
১১. শ্রীধর (৯০০ খ্রিষ্টাব্দ)
১২. মঞ্জুলা (৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ)
১৩. দ্বিতীয় আর্যভট্ট (৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
১৪. প্রশস্তিধর (৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দ)
১৫. হলায়ুধ (৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ)
১৬. জয়দেব (১০০০ খ্রিষ্টাব্দ)
১৭. শ্রীপতি (১০৯৩ খ্রিষ্টাব্দ)
১৮. হেমচন্দ্র সুরি (১০৮৯ খ্রিষ্টাব্দ)
১৯. ভাস্কর (১১১৪–১১৮৫ খ্রিষ্টাব্দ)
২০. কঙ্গদেব (১২০৫ খ্রিষ্টাব্দ)
২১. সঙ্গমগ্রামের মাধব (১৩৪০–১৪২৫ খ্রিষ্টাব্দ)
২২. নারায়ণ পণ্ডিত (১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
২৩. পরমেশ্বর (১৩৬০–১৪৫৫ খ্রিষ্টাব্দ)
২৪. নীলকণ্ঠ সোমাইজি (১৪৫৫–১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দ)
২৫. শঙ্কর বারিয়ার (১৫০০–১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দ)

২৬. নারায়ণ (১৫০০–১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দ)
২৭. জৈষ্ঠ্যদেব (১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
২৮. অচ্ছুৎ পিসারতি (১৫৫০–১৬২১ খ্রিষ্টাব্দ)
২৯. পুতুমানা সোমায়াজি (১৬৬০–১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দ)
৩০. জগন্নাথ পণ্ডিত (১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ)
৩১. শঙ্কর বর্মণ (১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ)

গ্রিক

১. থেলস (৬৩০–৫৫০ খ্রিষ্টপূর্ব)
২. অ্যানাক্সিম্যান্ডার (৬১০–৫৪৭ খ্রিষ্টপূর্ব)
৩. পিথাগোরাস (৫৭০–৪৯০ খ্রিষ্টপূর্ব)
৪. অ্যানাক্সিমেনেস (৫৪৬ খ্রিষ্টাব্দ)
৫. ক্লিওস্ট্র্যাটাস (৫২০ খ্রিষ্টাব্দ)
৬. অ্যানাক্সোগোরাস (৫০০–৫২৮ খ্রিষ্টপূর্ব)
৭. জেনো (৪৯০–৪৩০ খ্রিষ্টাব্দ)
৮. অ্যান্টিফন (৪৮০–৪১১ খ্রিষ্টাব্দ)
৯. ইনোপিড (৪৫০ খ্রিষ্টপূর্ব)
১০. লিওসিপ্পাস (৪৫০ খ্রিষ্টপূর্ব)
১১. হিপোক্রেটাস (১৫০ খ্রিষ্টপূর্ব)
১২. মেটোন (৪৩০ খ্রিষ্টপূর্ব)
১৩. হিপ্পিয়াস (৪২৫ খ্রিষ্টপূর্ব)
১৪. থিওডোরাস (৪২৫ খ্রিষ্টপূর্ব)
১৫. সক্রেটিস (৪৬৯–৩৯৯ খ্রিষ্টপূর্ব)
১৬. ফিলোলাস (৩৯০ খ্রিষ্টপূর্ব)
১৭. ডেমোক্রিটাস (৪৬০–৩৭০ খ্রিষ্টাব্দ)
১৮. হিপ্পাসাস (৪০০ খ্রিষ্টপূর্ব)
১৯. আর্চিটাস (৪২৮–৩৪৭ খ্রিষ্টপূর্ব)
২০. প্লেটো (৪২৭–৩৪৭ খ্রিষ্টপূর্ব)
২১. থিয়েটেটাস (৪২৮–৩৪৭ খ্রিষ্টপূর্ব)
২২. লিওদামাস (৩৮০ খ্রিষ্টপূর্ব)
২৩. লিওন (৩৭৫ খ্রিষ্টপূর্ব)
২৪. ইউডোক্সাস (৪০০–৩৫৭ খ্রিষ্টপূর্ব)

২৫. ক্যালিপাস (৩৭০ খ্রিষ্টপূর্ব)
২৬. জেনোক্রেটাস (৩৯৬–৩১৪ খ্রিষ্টপূর্ব)
২৭. হেরাক্লাইডস (৩৯০–৩২২ খ্রিষ্টপূর্ব)
২৮. ব্রাইসন (৩৬০ খ্রিষ্টপূর্ব)
২৯. মেনিখমুস (৩৫০ খ্রিষ্টপূর্ব)
৩০. থিওডিয়াস (৩৫০ খ্রিষ্টপূর্ব)
৩১. থাইম্যারিডাস (৩৫০ খ্রিষ্টপূর্ব)
৩২. ডাইনোস্ট্রাস (৩৫০ খ্রিষ্টপূর্ব)
৩৩. স্পেডিসিপ্পাস (৩৩৯ খ্রিষ্টপূর্ব)
৩৪. অ্যারিস্টটল (৩৮৪–৩২২ খ্রিষ্টপূর্ব)
৩৫. অ্যারিস্টাস (৩৫০–৩৩০ খ্রিষ্টপূর্ব)
৩৬. ইউডেমাস (৩৩৫ খ্রিষ্টপূর্ব)
৩৭. ইউক্লিড (২৯৫ খ্রিষ্টপূর্ব)
৩৮. অ্যারিস্টারকাস (৩১০–২৩০ খ্রিষ্টপূর্ব)
৩৯. আর্কিমিডিস (২৮৭–২১২ খ্রিষ্টপূর্ব)
৪০. ফিলো (২৫০ খ্রিষ্টপূর্ব)
৪১. নিকোটেলেস (খ্রিষ্টপূর্ব)
৪২. স্ট্রাটো (খ্রিষ্টপূর্ব)
৪৩. পারসিয়াস (খ্রিষ্টপূর্ব)
৪৪. ইরাতোস্থেনেস (খ্রিষ্টপূর্ব)
৪৫. ক্রিসিপ্পাস (খ্রিষ্টপূর্ব)
৪৬. কনোন (খ্রিষ্টপূর্ব)
৪৭. অ্যাপোলোনিয়াস (খ্রিষ্টপূর্ব)
৪৮. নিকোমেডেস (খ্রিষ্টপূর্ব)
৪৯. দোসিথিউস (খ্রিষ্টপূর্ব)
৫০. পারসেউস (খ্রিষ্টপূর্ব)
৫১. ডাইনোসোডোরাস (খ্রিষ্টপূর্ব)
৫২. ডায়োকলস (খ্রিষ্টপূর্ব)
৫৩. হিপসিকাস (খ্রিষ্টপূর্ব)
৫৪. হিপ্পারকাস (খ্রিষ্টপূর্ব)
৫৫. জেনোডোরাস (খ্রিষ্টপূর্ব)

৫৬. পসিডোনিয়াস (খ্রিষ্টপূর্ব)
৫৭. সিডোনের জেনো (খ্রিষ্টপূর্ব)
৫৮. জেমিনাস (খ্রিষ্টপূর্ব)
৫৯. হেরোন (খ্রিষ্টপূর্ব)
৬০. থিওডোসিয়াস (খ্রিষ্টপূর্ব)
৬১. ক্লিওমেডেস (খ্রিষ্টপূর্ব)
৬২. মেনেলাস (খ্রিষ্টাব্দ)
৬৩. নিকোমেকাস (খ্রিষ্টাব্দ)
৬৪. থিওন (খ্রিষ্টাব্দ)
৬৫. টলেমি (খ্রিষ্টাব্দ)
৬৬. ম্যারিনাস (খ্রিষ্টাব্দ)
৬৭. অ্যাপোলিয়াস (১২৪–১৭০ খ্রিষ্টাব্দ)
৬৮. ডায়োজিনস (২০০ খ্রিষ্টাব্দ)
৬৯. ডায়োফ্যান্টাস (২০০ খ্রিষ্টাব্দ)
৭০. পরফিরি (২৩৪–৩০৫ খ্রিষ্টাব্দ)
৭১. আনাতোলিয়াস (২৮০ খ্রিষ্টাব্দ)
৭২. স্পোরাস (২৮০ খ্রিষ্টাব্দ)
৭৩. ল্যাম্বিকাস (২৫০–৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
৭৪. পাপ্পাস (৩২০ খ্রিষ্টাব্দ)
৭৫. সেরেনাস (৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
৭৬. সিনেসিয়াস (৩৭০–৪১৩ খ্রিষ্টাব্দ)
৭৭. হাইপেশিয়া (৩৭০–৪১৩ খ্রিষ্টাব্দ)
৭৮. ডোমিনাস (৪৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
৭৯. প্রোক্লাস ডায়োডোকাস (৪১০–৪৮৫ খ্রিষ্টাব্দ)
৮০. ম্যারিনাস (৪৮০ খ্রিষ্টাব্দ)
৮১. মেট্রোডোরাস (৫০০ খ্রিষ্টাব্দ)
৮২. সিম্পলিসিয়াস (৫৩০ খ্রিষ্টাব্দ)
৮৩. অ্যান্থেমিয়াস (৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)
৮৪. জন ফিলোপেনাস (৫২০ খ্রিষ্টাব্দ)
৮৫. ইসিডোরাস (৫৪০ খ্রিষ্টাব্দ)
৮৬. ইউটোসিয়াস (৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ)

৮৭. ইসিডোর (৫৭০–৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দ)
৮৮. মাইকেল কনস্ট্যানটাইন সেলাস (১০১৮–১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ)
৮৯. জর্জিয়াস পাচিমেরেস (১২৪২–১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ)
৯০. ম্যাক্সিমাস প্ল্যানুডেস (১২৫৫–১৩১০ খ্রিষ্টাব্দ)
৯১. ম্যানুয়েল মশোপলোস (১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ)

সৌদি আরব

১. বানু মুসা (নবম শতক)
২. আল হাজ্জাজ ইবন মাতার (৮০০ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. মুহাম্মদ ইবন মুজা আল খোয়ারিজিমি (৭৮০–৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
৪. হুনায়ন ইবন ইসহাক (৮০৮–৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ)
৫. আব্দ আল হামিদ ইবন তুর্ক (৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
৬. আহমেদ ইবন আবদুল্লাহ আল মারওয়াজি হাবাস আল হাসিব (৯৫০ খ্রি.)
৭. থাবিত ইবন কুবরা (৯৩৬–৯০১ খ্রিষ্টাব্দ)
৮. আল ফাদল আল নাইরিজি (৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ)
৯. আবু কামিল ইবন আসলাম (৮৫০–৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ)
১০. কুস্তা ইবন লুকা (৯১২ খ্রিষ্টাব্দ)
১১. আবু আব্দুলাহ মোহাম্মদ ইবন জাবির আল বাত্তানী (৮৫৮–৯২৯ খ্রি.)
১২. আবু নাসর আল ফারাবি (৮৭৮–৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
১৩. ইব্রাহিম ইবন সিনান (৯০৯–৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ)
১৪. আবু সাহল আল কুহি (৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
১৫. আবুল হাসান আল উকলিদিসি (৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ)
১৬. আব্দুল আজিজ আল কাবিসি (৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
১৭. মুহাম্মদ আবুল ওয়াফা (৯৪০–৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ)
১৮. আব্দুল জলিল আল সিলজি (৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ)
১৯. আবু আলী আল হাসান ইবন আল হায়তাম (৯৬৫–১০৩৯ খ্রিষ্টাব্দ)
২০. আবুল রায়হান মুহাম্মদ ইবন আহমেদ আল বিরুনি (৯৭৩–১০৫৫ খ্রি.)
২১. আবু বকর আল কারাজি (১০০০ খ্রিষ্টাব্দ)
২২. আবু আব্দুল্লাহ আল হাসান আল বাগদাদী (১০০০ খ্রিষ্টাব্দ)
২৩. কুশায়র ইবন লাব্বান (১০০০ খ্রিষ্টাব্দ)
২৪. মাসলামা আল মাজরিতি (১০০০ খ্রিষ্টাব্দ)

২৫. আবু মানসুর আল বাগদাদী (১০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)
২৬. আবু নাসর মানসুর ইবন ইরাক (১০৩০ খ্রিষ্টাব্দ)
২৭. আব্দুল রাহমান আল খাজিনি (১১৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
২৮. আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবন আহমেদ ইবন মুহাম্মদ ইবন রুশদ (১১২৬–১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দ)
২৯. ইবন ইয়াহিয়া আল সামাওয়াল (১১২৫–১১৮০ খ্রিষ্টাব্দ)
৩০. শারাফ আল দিন আত তুসি (১১৭৫ খ্রিষ্টাব্দ)
৩১. নাসির আল দিন আত তুসি (১২০১–১২৭৪ খ্রিষ্টাব্দ)
৩২. মুহাম্মদ আল খালিলি (১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
৩৩. ইবন আল বান্না (১২৫৬–১৩২১ খ্রিষ্টাব্দ)
৩৪. ঘিয়াথ আল দিন আল কাশি (১৪২৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৩৫. উলুঘ বেগ (১৩৯৪–১৪৪৯ খ্রিষ্টাব্দ)

জাপান

১. ইওশিদা কোউ (১৫৯৮–১৬৭২ খ্রিষ্টাব্দ)
২. সেকি কোওয়া (১৬৪২–১৭০৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. তাকেবে কেনকো (১৬৬৪–১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৪. মাৎসুনাগা রিওহিৎসু (১৭১৮–১৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৫. কুরুশিমা ইওশিতা (১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)
৬. আরিমা রাইদো (১৭১৪–১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)
৭. আজিমা চোকুয়েন (১৭৩৯–১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)
৮. আইদা আম্মেই (১৭৪৭–১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দ)
৯. সাকাবে কোহান (১৭৫৯–১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দ)
১০. হাসেগাওয়া কেন (১৭৮৩–১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দ)
১১. ওয়াদা নেই (১৭৮৭–১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ)
১২. শিরাইয়াসি চোচু (১৭৯৬–১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দ)
১৩. কোইদে শুকি (১৭৯৭–১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দ)
১৪. ওমুরা ইশু (১৮২৪–১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ)

ইউরোপ (পনেরোশ শতক পর্যন্ত)

১. মার্কাস তেরেনতিয়াস (১১৬–২৭ খ্রিষ্টপূর্ব)
২. বালবাস (১০০ খ্রিষ্টাব্দ)

৩. আনিসিয়াস মলিয়াস সেভেরিনাস বোইথিয়াস (৪৮০–৫২৪ খ্রিষ্টাব্দ)
৪. ফ্ল্যাভিয়াস ম্যাগনাস অরেলিয়াস ক্যাসিওডোরাস (৪৯০–৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দ)
৫. বেদে (৬৭৩–৭৩৫ খ্রিষ্টাব্দ)
৬. গার্বাট ডিঅরিলাক, পোপ সিলভেস্টার দ্বিতীয় (৯৪৫–১০০৩ খ্রিষ্টাব্দ)
৭. অ্যাডেলার্ড অব বাথ (১০৭৫–১১৬৪ খ্রিষ্টাব্দ)
৮. জন অব সেভিল (১১২৫ খ্রিষ্টাব্দ)
৯. প্লেটো অব তিভোলি (১১২৫ খ্রিষ্টাব্দ)
১০. জিরার্ড অব ক্রেমোনা (১১১৪–১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দ)
১১. রবার্ট অব চেস্টার (১১৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
১২. রবার্ট গ্রোসেতেস্ট (১১৬৮–১২৫৩ খ্রিষ্টাব্দ)
১৩. লিওনার্দো অব পিসা (১১৭০–১২৪০ খ্রিষ্টাব্দ)
১৪. আলেক্সান্দার ডি ভিলেডিও (১২২৫ খ্রিষ্টাব্দ)
১৫. জন অব হ্যালিফেক্স (১২০০–১২৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)
১৬. ক্যামপানাস অব নোভারা (১২০৫–১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দ)
১৭. জিরার্ড অব ব্রাসেলস (১২৩৫ খ্রিষ্টাব্দ)
১৮. জরডানাস ডে নিমর (১২৩০–১২৬০ খ্রিষ্টাব্দ)
১৯. উইলহেম অব মোয়েরবেক (১২১৫–১২৮৬ খ্রিষ্টাব্দ)
২০. রজার বেকন (১২১৯–১২৯২ খ্রিষ্টাব্দ)
২১. জন পেকহ্যাম (১২৩০–১২৯২ খ্রিষ্টাব্দ)
২২. ভিটেলিও (১২৫০–১২৭৫ খ্রিষ্টাব্দ)
২৩. জন ডানস স্কটাস (১২৬৬–১৩০৮ খ্রিষ্টাব্দ)
২৪. উইলিয়াম অব ওকহ্যাম (১২৮০–১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দ)
২৫. রিচার্ড অব ওয়ালিংফোর্ড (১২৯১–১৩৩৬ খ্রিষ্টাব্দ)
২৬. থমাস ব্রাডওয়ার্ডিন (১২৯৫–১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দ)
২৭. নিকোলাস রাভডাস (১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
২৮. জাঁ বুরিডান (১৩০০–১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দ)
২৯. জন অব মায়ারস (১৩৪৩ খ্রিষ্টাব্দ)
৩০. আলবার্ট অব সাক্সেন (১৩১৬–১৩৯০ খ্রিষ্টাব্দ)
৩১. নিকোল ওরসোম (১৩২৫–১৩৮২ খ্রিষ্টাব্দ)
৩২. জন অব ডাম্বলটন (১৩৪৫ খ্রিষ্টাব্দ)
৩৩. উইলিয়াম অব হেইটেসবেরি (১৩৭৩ খ্রিষ্টাব্দ)

৩৪. ডোমিনিকবাস ডে ক্ল্যাভিসিও (১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দ)
৩৫. ইম্মানুয়েল বোনফিলস (১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
৩৬. জিওভানি ডি কাসালি (১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
৩৭. রিচার্ড সোয়াইনসহেড (১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
৩৮. আন্তেনিও দে মাজিংঘি (১৩৫৩ খ্রিষ্টাব্দ)
৩৯. পাওলো ডেল পোজো তোসকানেলি (১৩৯৭–১৪৮২ খ্রিষ্টাব্দ)
৪০. নিকোলাস অব কুসা (১৪০১–১৪৬৪ খ্রিষ্টাব্দ)
৪১. লিওন বাতিস্তা আলবার্টি (১৪০৪–১৪৭২ খ্রিষ্টাব্দ)
৪২. পিয়েরো ডেলা ফ্রান্সেসকো (১৪১০–১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ)
৪৩. জর্জ পিউরবাথ (১৪২৩–১৪৬১ খ্রিষ্টাব্দ)
৪৪. জোহানেস ক্যাম্পানাস (১৪৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
৪৫. জোহান মুলার অব কোনিগসবার্গ (১৪৩৬–১৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দ)
৪৬. লুকা পাসিওলি (১৪৪৫–১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দ)
৪৭. নিকোলাস চুকুয়েট (১৪৪৫–১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ)
৪৮. লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২–১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৪৯. জোহান উইডম্যান (১৪৬০ খ্রিষ্টাব্দ)
৫০. সিপিওন দেল ফেরো (১৪৬৫–১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ)
৫১. জোহানেস ওয়ার্নার (১৪৬৮–১৫২২ খ্রিষ্টাব্দ)
৫২. আলব্রেখট দুরার (১৪৭১–১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৫৩. নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৬–১৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দ)

গণনা করার বোর্ড

চীনের মিং সাম্রাজ্যের (Ming Dynasty) কথা। এই সময় ওয়ারিং রাজ্যে এক ধরনের গণনা পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। এই গণনা পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হতো কিছু গণনা করার দণ্ড এবং একটি গণনা করার বোর্ড।

গণনা করার বোর্ডে গণনা করার কাজ করা হচ্ছে

গণনা দণ্ডটি মূলত বাঁশ বা এই জাতীয় কোনো কিছু দিয়ে তৈরি করা হতো। এই দণ্ডগুলো লম্বায় ১২ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার (৪.৭ থেকে ৬ ইঞ্চি) এবং ২ থেকে ৪ মিলিমিটারের মতো পুরু ছিল। কখনও কখনও এসব দণ্ড তৈরি করার জন্য প্রাণীর অস্থি, হাতির দাঁত ইত্যাদি ব্যবহার করা হতো। সৌকর্যময় বা মূল্যবান পণ্য হিসেবে তৈরি করার জন্য কখনও কখনও এসব গণনা দণ্ডে জেড পাথরও লাগানো হতো।

গণনা করার বোর্ডটির ক্ষেত্রে তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না।

সালামিস ট্যাবলেট

প্রাচীনকালের গণনা করার জন্য বেশ কয়েক ধরনের বোর্ডই ব্যবহার করা হতো। এর মধ্যে এখনও যেসব বোর্ড টিকে রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সারামিস ট্যাবলেট (Salamis Tablet) সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন। এটি মূলত মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি করা হতো। তবে প্রাথমিকভাবে একে একটি খেলার দোলনা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

ধারণা করা হয়, ব্যাবিলনিয়রা খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে এই ধরনের ট্যাবলেট বা বোর্ড গণনা করার কাজে ব্যবহার করতো।

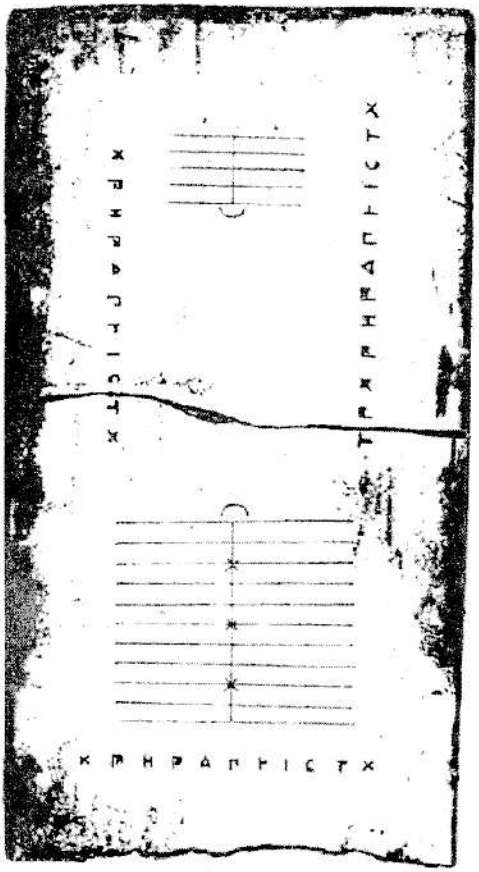

সালামিস ট্যাবলেট

প্রথমবারের মতো সালামিস ট্যাবলেটের সন্ধান পাওয়া গেছে গ্রিসের সালামিস দ্বীপ থেকে। এই দ্বীপের প্রথম নাম ছিলো কৌলৌরি (Koullouri)। এটি সারোনিক গালফের সবচেয়ে বড়ো গ্রিক দ্বীপ। এর অবস্থান এথেন্স থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার পশ্চিমে। ১৮৪৬ সালে এই দ্বীপে পরিচালিত এক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে এই ট্যাবলেটটির সন্ধান পাওয়া যায়।

এটি প্রকৃতপক্ষে একটি পাথরের স্ল্যাব যার আকার ১৪৯ সেন্টিমিটার বা ৬৬.৫ ইঞ্চি লম্বা এবং প্রস্থে প্রায় ৭৫ সেন্টিমটির বা ২৯.৫ ইঞ্চি এবং ৪.৫ সেন্টিমিটার বা প্রায় দুই ইঞ্চি পুরু ছিলো। এই পাথরের উপর ৫টি আড়াআড়ি দাগ কাটা আছে, যাদের একটি উলম্বরেখা সমান দুইভাগে ভাগ করে রেখেছে। এই আড়াআড়ি বা আনুভূমিক রেখাগুলোর নিচে একটি ছোট আকারের অর্ধচন্দ্রাকৃতির রেখা রয়েছে।

স্ল্যাবের নিচের অর্ধাংশে আড়াআড়ি বা আনুভূমিকভাবে মোট ১১টি রেখা টানা আছে, যাকে একটি উলম্ব রেখা ঠিক সমান দুইভাগে ভাগ করে রেখেছে। এক্ষেত্রে আনুভূমিক রেখাসমূহের উপরের অংশে ছোট আকারের অর্ধচন্দ্রাকৃতির রেখা রয়েছে। তবে এই অংশের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এসব রেখার মধ্যে উলম্ব রেখাটি ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৯ম স্থানে একটি করে তারকাচিহ্নিত অবস্থায় রয়েছে।

এছাড়াও এই স্ল্যাবে তিন সারি গ্রিক অক্ষর উৎকীর্ণ করা ছিলো, যাদের অবস্থান ছিলো স্ল্যাবের ডানদিকে, বামদিকে এবং নিচের দিকে।

এই ট্যাবলেটটি গণনার কাছে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতো বলে ঐতিহাসিকরা দাবি করেন।

আইবিএম–এর জন্মরহস্য

১৮৯৬ সালের দিকে টেবুলেটিং মেশিনের জনক হারম্যান হালারিথ একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেন, যার নাম টেবুলেটিং মেশিন কোম্পানি (Tabulating Machine Co.)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারি কাজে ব্যবহারের জন্য এই কোম্পানিটি টেবুলেটিং মেশিন সরবরাহ করার অনুমতি পায়। ১৮৯৯ সালের ১৯শে আগস্ট হারপার'স উইকলি *(Harper's Weekly)* পত্রিকায় টেবুলেটিং মেশিনের উপর প্রকাশিত প্রতিবেদন ও ছবি দেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারির জন্য নির্ধারিত দপ্তর এই মেশিন সরবরাহ করার জন্য টেবুলেটিং মেশিন কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়।

কিন্তু হোলারিথের কোম্পানি নিজেদের তৈরি করা টেবুলেটিং মেশিন বিক্রি করতেন না। মেশিনগুলো তারা ভাড়া দিতেন। যাহোক, ১৯০১ সালের দিকে মার্শাল ফিল্ড (Marshall Field) নিজের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য হোলারিথের টেবুলেটিং মেশিন ব্যবহার করতে শুরু করেন।

১৯০৪ সালে পেনসিলভানিয়া স্টিল কোম্পানি হোলারিথের মেশিন ব্যবহার করতে শুরু করে। পণ্যের উৎপাদন ব্যয়, কাঁচামাল ও শ্রমিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই মেশিন ব্যবহার করা হতো।

১৯০৪ সালের পর টেবুলেটিং মেশিনের বাণিজ্যিক ব্যবহার অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে রেইলরোড কোম্পানিগুলো (railroad companies) এই মেশিন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। তবে শুধু রেইলরোড কোম্পানিই নয়, রেইলরোড, বিভিন্ন ধরনের ইউটিলিটিজ, প্রস্তুতকারক এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহেও এই মেশিনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে সরকারের রাজস্ব আদায়ের হারও প্রায় ২০গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে সর্বমোট ছয়টি রেইলরোড প্রতিষ্ঠান হোলারিথের টেবুলেটিং মেশিন ব্যবহার করতে শুরু করে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইস্টম্যান কোডাক, ন্যাশনাল টিউব, আমেরিকান শিট এবং টিন প্লেট, ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক, ইয়েল এবং টাউন অন্যতম।

১৯০৩ সালের দিকে সাইমন নর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনসাস ব্যুরোর পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি হোলারিথের আবিষ্কৃত টেবুলেটিং মেশিনগুলো জরিপ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে হোলারিথের সাথে জরিপ ব্যুরোর মনমালিন্য সৃষ্টি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে

হোলারিথ সেখান থেকে তার সব মেশিন সরিয়ে আনেন। এতে একদিকে যেমন জরিপ ব্যুরোর কাজে ভাটা পড়ে তেমনি হোলারিথের টেবুলেটিং মেশিন কোম্পানি তাদের একটি বাধা খদ্দের হারায়।

১৯০৭ সালের দিকে জরিপ ব্যুরো টেবুলেটিং মেশিনের বিকল্প কোনো মেশিন আবিষ্কারের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

তবে হোলারিথের টেবুলেটিং মেশিন কোম্পানি প্রকৃতঅর্থেই চরম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয় ১৯১০ সালের দিকে।

কিন্তু ১৯১১ সালের মধ্যে হোলারিথের টেবুলেটিং মেশিন কোম্পানি প্রায় ১০০টি প্রতিষ্ঠানের কাজ করার জন্য নিবন্ধিত হয়। ইতোমধ্যে টেবুলেটিং মেশিন কোম্পানি তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানদের একত্রিত করে প্রাথমিকভাবে কম্পিউটিং টেবুলেটিং রেকর্ডিং কোম্পানি (Computing Tabulating Recording Co.) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে। পরবর্তীকালেই এই কোম্পানিই ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন নামে একটি বিশালাকার প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়।

সফটওয়্যারের বিষয়-আসয়

কম্পিউটার কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে লিখিত কিছু কমান্ড বা নির্দেশের সমষ্টি বা তালিকাকে সফটওয়্যার (Software) বা প্রোগ্রাম (Program) নামে অভিহিত করা যায়। বর্তমানকালে সারা বিশ্বেই সফটওয়ারের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যভাবে বলা যায়, কোনো একটি সমস্যার সমাধান বা কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য কম্পিউটারকে প্রদত্ত নির্দেশনাকে সফটওয়্যার বলে। সফটওয়্যার প্রণয়নের জন্য কম্পিউটারের ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভিজুয়াল বেসিক (Visual Basic), ফোরট্রান (Fortran), সি (C), সি++ (C++) ইত্যাদি প্রোগ্রামিং ভাষার কথা উল্লেখ করা যায়।

সাধারণভাবে যে ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা হয়, সে ভাষার নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মেনেই প্রোগ্রাম লিখতে হয়। প্রোগ্রামে নির্দেশাবলী যথাযথ না হলে, বা অসম্পূর্ণ নির্দেশের সমষ্টি থাকলে, বা নির্দেশে লেখার সময় বানানে কোনো ধরনের ভুল থাকলে প্রোগ্রামটি যথাযথভাবে কাজ করে না। এছাড়াও এ ধরনের প্রোগ্রাম চালনা করলে কম্পিউটারের নানা ধরনের সমস্যা প্রদর্শন করে। অসম্পূর্ণ প্রোগ্রাম কোনো সমস্যার সমাধান করে না। ফলে এ ধরনের কোনো প্রোগ্রামকে প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার হিসেব গণ্য করা হয় না।

সাধারণত প্রোগ্রাম লেখার সময় কিছু সমস্যা নির্বাচন করে নেওয়া হয়। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য ধাপে ধাপে নির্দিষ্ট ধরনের কিছু নির্দেশ বা কমান্ড সারিবদ্ধভাবে লিখতে হয়।

প্রোগ্রামে নির্দেশাবলী লেখার পদ্ধতি প্রোগ্রামিং ভাষার উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়। কোনো কোনো প্রোগ্রামে নির্দেশাবলী সারিবদ্ধভাবে লেখা হয়, কোনো কোনো প্রোগ্রামে নির্দেশাবলী সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে লেখা হয় আবার কোনো কোনো নির্দেশাবলী সারি এবং ধাপ দুটির সংমিশ্রণে লেখা হয়।

কম্পিউটারে ব্যবহৃত সফটওয়্যার বিভিন্ন ধরনের হয়। তবে আলোচনার সুবিধার্থে এদের দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন –

১। সিস্টেম সফটওয়্যার (System Software)

২। অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application Software)

নিচে এসব সফটওয়্যার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হচ্ছে–

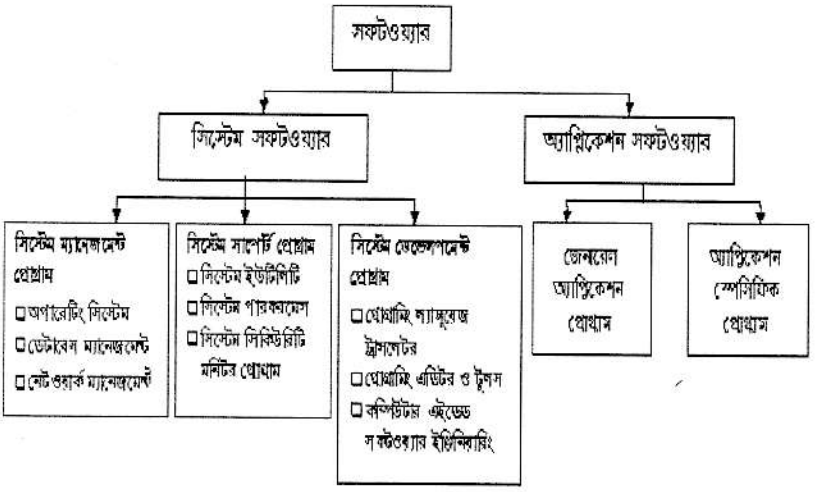

সফটওয়্যারের প্রকারভেদ

১। সিস্টেম সফটওয়্যার

কম্পিউটারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এই সিস্টেম সফটওয়্যার। এই ধরনের সফটওয়্যারের সাধারণ নাম হচ্ছে ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম (Disc Operating System)। অর্থাৎ কম্পিউটারের বিভিন্ন হার্ডওয়্যার পরিচালনা ও সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সাধারণভাবে যে ধরনের নির্দেশ সম্বলিত প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়, সেগুলোকে সিস্টেম সফটওয়্যার নামে অভিহিত করা যায়।

সাধারণভাবে কম্পিউটারের কাজের উপযোগী করে সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরি হয়। তাই বিভিন্ন কাজের জন্য সিস্টেম সফটওয়্যারও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়। এক ধরনের কম্পিউটারের উপযোগী করে প্রণীত সফটওয়্যার সাধারণত অন্য ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়, তবে ক্ষেত্রবিশেষে সামান্য কিছু রদবদল করে এই ধরনের সফটওয়্যার ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সিস্টেম সফটওয়্যারকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন -

ক) সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (System Management Program)

খ) সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম (System Support Program)

গ) সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (System Development Program)

নিচে এসব প্রোগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে -

সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম

এ ধরনের প্রোগ্রাম দিয়ে মূলত কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ডাটা ও নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম সাধারণত নিম্নলিখিত ইউনিটসমূহ দিয়ে গঠিত হয়।

অ) **অপারেটিং সিস্টেম** (Operating System): এই ধরনের সফটওয়্যার দিয়ে মূলত কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারকে সচল করে তোলা হয়। ডস, উইন্ডোজ, লিনাক্স, ম্যাকওএস, ইত্যাদি এই ধরনের কয়েকটি সফটওয়্যার পরিবার।

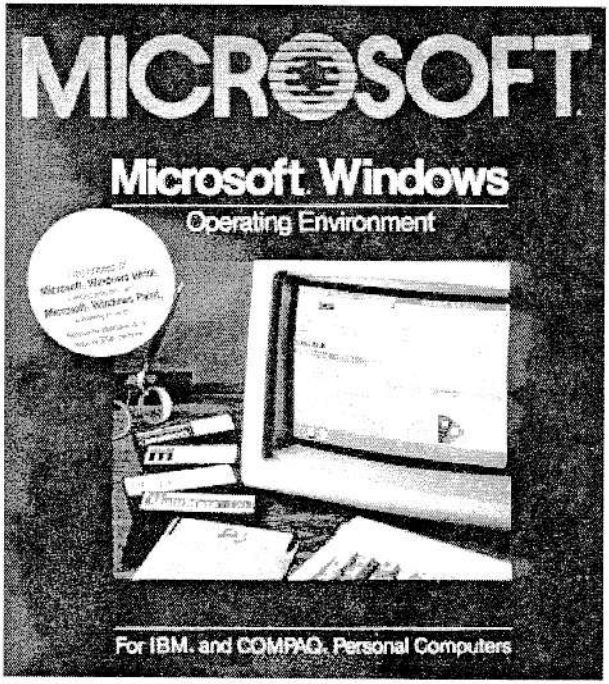

উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম

আ) **ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম** (Database Management System): এই ধরনের সফটওয়্যার দিয়ে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের তথ্য একত্রিত, তুলনা ও পর্যালোনা করা হয়। মাইক্রোসফট অ্যাকসেস, ওরাকল, ইত্যাদি এই ধরনের কয়েকটি সফটওয়্যার পরিবার।

ই) **নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম** (Network Management Program): এই ধরনের সফটওয়্যার দিয়ে সাধারণত বিভিন্ন কম্পিউটারের মধ্যে

যোগসূত্র রচনা ও তথ্যের আদান-প্রদান করা হয়। ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, নেটস্কেপ নেভিগেটর, অ্যাভান্ট ব্রাউজার, অ্যাডভান্সড ব্রাউজার, মজিলা ফায়াফক্স, ফাস্ট ব্রাউজার, স্লিম ব্রাউজার, কাপাসা ব্রাউজার, আকু ব্রাউজার, পকেট ব্রাউজার ইত্যাদি এ ধরনের কিছু সফটওয়্যার।

সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম

এই ধরনের প্রোগ্রাম দিয়ে কম্পিউটার ব্যবহারী সার্ভিস প্রোগ্রাম, নিরাপত্তা প্রদানের প্রোগ্রাম এবং কাজের হিসাব-নিকাশসহ বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে পারে। সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম সাধারণত নিম্নলিখিত ইউনিটসমূহ দিয়ে গঠিত হয়।

১. **সিস্টেম ইউটিলিটি প্রোগ্রাম:** এই ধরনের প্রোগ্রাম দিয়ে সিস্টেমের বিভিন্ন ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ, সিস্টেমের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হয়। এই ধরনের প্রোগ্রামের উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম-এর মধ্যে স্ক্যান ডিস্ক, ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্ট, নর্টন ইউটিলিটি, ফিক্স ইট, সান্ড্রা সফট, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২. আ) **সিস্টেম পারফরমেন্স মনিটর প্রোগ্রাম:** কম্পিউটার সিস্টেমের পারফরমেন্স যথাযথ রাখার উপর কম্পিউটারের কার্যকারিতা কম-বেশি নির্ভর করে। সিস্টেম পারফরমেন্স মনিটর প্রোগ্রামসমূহ এ কাজে সহায়তা করে। এই ধরনের প্রোগ্রামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম-এর সিস্টেম মনিটর, নেট ওয়াচার, ইত্যাদি অন্যতম।

৩. **সিস্টেম সিকিউরিটি মনিটর প্রোগ্রাম:** সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এই ধরনের প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়। উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম-এর নিজস্ব সিস্টেম রিসোর্স মিটার, নর্টন ইউটিলিটিস-এর সিস্টেম সিকিউরিটি চেক, ইত্যাদি অন্যতম।

সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম

কম্পিউটার ব্যবহারকারীর ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে সিস্টিম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়। সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামসমূহকে সাধারণত নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়।

অ) প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেটর বা অনুবাদক

আ) প্রোগ্রামিং এডিটর এবং টুলস

ই) কম্পিউটার এইডেড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং প্যাকেজ

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার

এই ধরনের সফটওয়্যারকে ব্যবহারিক সফটওয়্যার নামেও অভিহিত করা হয়। কারণ এই ধরনের সফটওয়্যার মূলত ব্যবহারকারীর প্রাত্যহিক ও ব্যভহারিক সমস্যা সমাধান, তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য বিনিময়, তথ্য পর্যালোচনা, প্রযুক্তিগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত সফটওয়্যারকে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার নামে অভিহিত করা হয়। ব্যবহারিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচুর সফটওয়্যার বাজারে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে পাওয়া যায়। অনেকে এই ধরনের সফটওয়্যারকে প্যাকেজ প্রোগ্রাম নামেও অভিহিত করে থাকেন। অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে আলোচনার সুবিধার্থে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন -

১) সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম
২) অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক প্রোগ্রাম

নিচে এসব প্রোগ্রাম সম্পর্কে সংক্ষেপে পরিচিতমূলক আলোচনা করা হচ্ছে।

সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম

কম্পিউটার ব্যবহারকারীর প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ধরনের কাজ সমাধার জন্য এবং জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামসমূহ ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের প্রোগ্রামের সাহায্যে যে কোনো কম্পিউটার ব্যবহারকারী ওয়ার্ড প্রসেসিং, স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম, ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট, গ্রাফিক্স, ব্রাউজিং, ই-মেইল, ডেস্কটপ পাবলিশিং, ইত্যাদি কাজ খুব সহজেই করতে পারেন। নিচে এই ধরনের কিছু অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের নাম উল্লেখ করা হলো-

ক) **সফটওয়্যার স্যুইট** : মাইক্রোসফট অফিস (১২টি প্রোগ্রামের সমন্বয়), লোটাস স্মার্ট স্যুইট (৮টি প্রোগ্রামের সমন্বয়), কোরেল ওয়ার্ড পারফেক্ট অফিস (৬টি প্রোগ্রামের সমন্বয়), ওপেন অফিস (৫টি প্রোগ্রামের সমন্বয়), ইত্যাদি

খ) **ওয়েব ব্রাউজার** : ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, নেটস্কেপ কমিউনিকেটর, অপেরা, ইত্যাদি

গ) **ই-মেইল** : ইন্টারনেট মেইল, ইউডোরা, ইত্যাদি

ঘ) **ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট** : মাইক্রোসফট অ্যাকসেস, ওরাকল, ডি-বেজ, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য

ঙ) **গ্রাফিক্স** : অ্যাডোব ফটোশপ, অ্যাডোব ইলাসস্ট্রেটর, পোজার, কোরেল ড্র, কোয়ার্ক এক্সপ্রেস, ৩উ স্টুডিও ম্যাক্স, মায়া, ইত্যাদি

চ) **ডেস্কটপ পাবলিশিং** : অ্যাডোব পেজমেকার, মাইক্রোসফট পাবলিশার, ইত্যাদি

নিচে তিনটি বিখ্যাত সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানের সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম উল্লেখ করা হলো।

প্রোগ্রাম	মাইক্রোসফট	লোটাস	কোরেল
ওয়ার্ড প্রসেসিং	এমএস ওয়ার্ড MS Word	ওয়ার্ডপ্রো Word Pro	ওয়ার্ড পারফেক্ট Word Perfect
স্পেডশীট	এমএস এক্সেল MS Excel	১-২-৩ ১-২-৩	কোয়াট্রো - প্রো Quarttro-Pro
প্রেজেন্টেশন	এমএস পাওয়ার পয়েন্ট MS Powerpoint	ফ্রিলেন্স Freelance	প্রেজেন্টেশনস Presentations
ডেটাবেস	এমএস অ্যাকসেস MS Access	অ্যাপ্রোচ Approach	প্যারাডক্স Paradox
পারসনাল ইনফরমেশন	এমএস আউটলুক MS Outlook	অর্গানাইজার Organiser	কোরেল সেন্ট্রাল Corel Central

অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক প্রোগ্রাম

কোনো সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য বা সুনির্দিষ্ট কোনো সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট প্রোগ্রামকে অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক প্রোগ্রাম বা ব্যবহার সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম নামে অভিহিত করা হয়।

ধারাবাহিক উইন্ডোজ

জুলাই মাস। ১৯৮১ সাল।

মাইক্রোসফটের কর্ণধার বিল গেটস অনুধাবন করতে পারেন যে, তাঁরা আসলে একটি স্বর্ণখনির উপর বসে আছেন। একটি কোম্পানি ইতোমধ্যেই 86-DOS-কে লাইসেন্স করার জন্য সিয়াটেল কম্পিউটারকে (Seattle Computer) প্রস্তাব দিয়ে দিয়েছে।

মাইক্রোসফটের কর্ণধার বিল গেটস, পল অ্যালানের সাথে

মাইক্রোসফট এই সুযোগটি কাজে লাগায়। তারা ১৯৮১ সালের ২৭শে জুলাই ৫০,০০০ ডলারের বিনিময়ে DOS কিনে নেয়। যে চুক্তির বলে মাইক্রোসফট এই স্বত্ব লাভ করলো, সেটি 'শতাব্দীর সেরা চুক্তি' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

সিয়াটেল কম্পিউটার একটি রয়্যালিটি মুক্ত লাইসেন্স (Free License) লাভ করে এবং কেবল প্রকৃত ক্রেতার জন্য লাইসেন্স দিতে থাকে। একই সাথে কোম্পানিটি মাইক্রোসফটের সকল ল্যাঙ্গুয়েজের উপর বিশেষ কমিশন পেতে থাকে।

মাইক্রোসফট ডস কিনে নেওয়ার পর থেকেই এর উন্নয়নের কাজ শুরু করে দেয়। ফলে ১৯৮১ সালের আগস্ট মাসেই ডস-এর প্রথম সংস্করণ বাজারে আসে। বাজারে এটি এমএস-ডস বা শুধু ডস নামেই ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে। টেক্সটভিত্তিক এই অপারেটিং সিস্টেমটি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই এটি বাজারে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

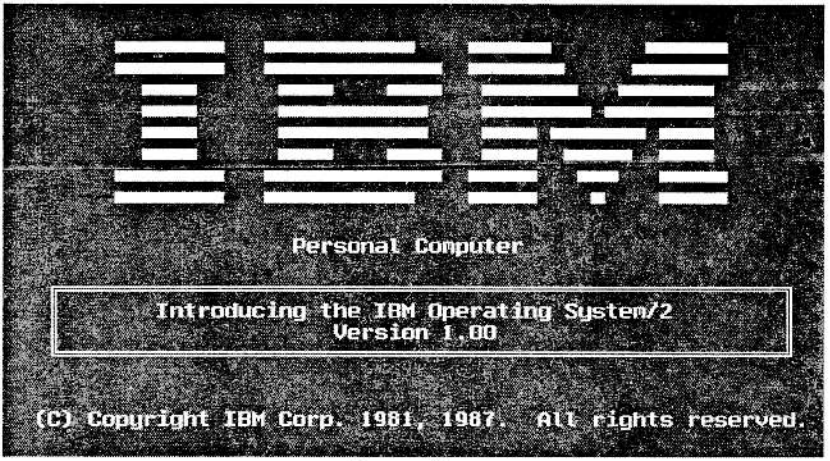

মাইক্রোসফট ডস

কম্পিউটার ব্যবহারকারীরা এটি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আগ্রহী হয়ে উঠেন। এরপর এগিয়ে চলে মাইক্রেসফটের বিজয় রথ, যা অদ্যাবধি চলছে বিশ্বব্যাপী।

সারণি – উইন্ডোজের ধারাবাহিক উন্নয়ন

DOS 1.0	অগাস্ট ১৯৮১
DOS 2.0	মার্চ ১৯৮৩
DOS 3.0	অগাস্ট ১৯৮৪
Windows 1.0	২০ নভেম্বর ১৯৮৫
DOS 4.0	অক্টোবর ১৯৮৬
Windows 2.0	৯ ডিসেম্বর ১৯৮৭
OS/2 1.0	ডিসেম্বর ১৯৮৭
OS/2 1.1	অক্টোবর ১৯৮৮
Windows 3.0	মে ১৯৯০
DOS 5.0	জুন ১৯৯১
OS/2 2.0	মার্চ ১৯৯২
Windows 3.1	এপ্রিল ১৯৯২
OS/2 2.1	মে ১৯৯৩
NT 3.1	জুলাই ১৯৯৩
NT 3.5	সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

OS/2 3.0	অক্টোবর ১৯৯৪
NT 3.51	জুন ১৯৯৫
Windows 95	অগাস্ট ১৯৯৫
OS/2 4.0	অগাস্ট ১৯৯৬
Windows NT 4.0	অগাস্ট ১৯৯৬
Windows 98	জুন ১৯৯৮
Windows 98SE	১৯৯৯
Windows 2000	ফেব্রুয়ারি ২০০০
Windows ME	সেপ্টেম্বর ২০০০
Windows Server 2008 (Windows NT 6.0)	ফেব্রুয়ারি ২০০৮
Windows XP (aka Windows NT 5.1)	মে ২০০৮
Windows Vista (Windows NT 6.0)	অক্টোবর ২০০৮
Windows 7 (Windows NT 6.1)	অক্টোবর ২০১০
Windows Server 2008 R2 (Windows NT 6.1)	অক্টোবর ২০১০

পবিত্র কোরআন শরিফে গণিত

১. পবিত্র কোরআন শরীফে প্রথম পংক্তিটি 'বিসমিল্লাহ' গঠিত হয়েছে ১৯টি বর্ণ দিয়ে। এই ১৯ সংখ্যার একক হলো ১। এই সংখ্যাটি পবিত্র কুরআন শরিফের সর্বত্র দেখা যায়।

২. কোরআন শরীফে রয়েছে ১১৪টি সুরা, এই সংখ্যাটি হলো ১৯ × ৬, অর্থাৎ ১৯–এর গুণিতক। এই ১৯ সংখ্যার একক হলো ১।

৩. কোরআন শরীফে রুকু সংখ্যা ৪৫০টি। সংখ্যাটি ৪৫ × ১০। এই সংখ্যার একক হলো ১০। এই ১০ সংখ্যার একক হলো ১।

৪. কোরআন শরীফে আয়াত সংখ্যা ৬৩৪৬। এটি ১৯–এর গুণিতক। অর্থাৎ ১৯ × ৩৩৪। এই ১৯ সংখ্যার একক হলো ১।

৫. কোরআন শরীফের শব্দ সংখ্যা ৮৬৪৩০। এই সংখ্যাটি ১০–এর গুণিতক। এখানে ১০ হলো একক হলো ১।

৬. কোরআন শরীফের অক্ষর সংখ্যা ৩৫০২২৭টি। এই সংখ্যার সমষ্টি হলো (৩+৫+০–২+২+৭)= ১৯। এই ১৯ সংখ্যার একক হলো ১।

৭. কোরআন শরীফের আয়াতসমূহের বৈশিষ্ট্য–

ক.	আদেশ রয়েছে	১০০০টি আয়াতে
খ.	নিষেধ রয়েছে	১০০০টি আয়াতে
গ.	দৃষ্টান্ত রয়েছে	১০০০টি আয়াতে
ঘ.	ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে	১০০০টি আয়াতে
ঙ.	অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির সংবাদ রয়েছে	৫০০টি আয়াতে
চ.	কেচ্ছা–কাহিনি রয়েছে	৫০০টি আয়াতে
ছ.	আল্লাহর তাস্‌বিহ সম্বন্ধে রয়েছে	১০০টি আয়াতে
জ.	নামাজ বিষয়ে রয়েছে	১০০টি আয়াতে

৮. কোরআন শব্দটি পবিত্র কোরআন শরীফে ৫৮ বার উচ্চারিত হয়েছে। এর মধ্যে একবার 'অন্য কোরআন' (১০:১৫), যা বাদ দিলে কোরআন শব্দটি এসেছে ৫৭ বার, যা ১৯-এর গুণিতক, ১৯ × ৩।

৯. কোরআন শরীফে 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি এসেছে ১১৪ বার। সুরা ৯–এ 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি নেই, কিন্তু সুরা ২৭–এর 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি ২ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১০. 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি যে সুরায় নেই, অর্থাৎ সুরা ৯ থেকে 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি যে সুরায় ২ বার রয়েছে, অর্থাৎ সুরা ২৭ এর মধ্যকার পার্থক্য ১৯।

১১. সুরা ৯৬-এ ৩০৪টি আরবি বর্ণ রয়েছে, যা ১৯-এর গুণিতক, ১৯ × ১৬ = ৩০৪।

১২. কোরআন শরীফে ৩০ ভিন্ন ভিন্ন পূর্ণ সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে। সংখ্যাগুলো হলো- ১; ২; ৩; ৪; ৫; ৬; ৭; ৮; ৯; ১০; ১১; ১২; ১৯; ২০; ৩০; ৪০; ৫০; ৬০; ৭০; ৮০; ৯৯; ১০০; ২০০; ৩০০; ১০০০; ২০০০; ৩০০০; ৫০০০; ৫০,০০০ এবং ১০০,০০০।

১৩. কোরআন শরীফের উল্লেখিত পূর্ণ সংখ্যাগুলোর সমষ্টি হলো ১,৬২,১৪৬। এটি ১৯-এর গুণিতক, ১৯ × ৮৫৩৪।

১৪. ইসলামে প্রথম স্তম্ভ 'লা ইলাহা ইল্লালাহু' (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই) কথাটির উল্লেখ করা হয়েছে ১৯টি সুরায়।

১৫. 'আল্লাহ' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে ১১৪টি সুরায়, ২৬৯৮ বার, এটি ১৯ সংখ্যার গুণিতক, অর্থাৎ ১৯ × ১৪২।

তথ্যসূত্র

1. David E. Smith and Jekuthiel Ginsburg. 1937 *Numbers and Numerals.* W. D. Reeves
2. Esther C. Ortenzi. 1964. *Numbers in Ancient Times.* J. Weston Walsh
3. Tobias Dantzig. 1954. *Number: The Language of Science.* Macmillan Company
4. Esther Ortenzi, 1964. *Numbers in Ancient Times.* Maine: J. Weston Walch

For more Bangla Books
Please Click HERE